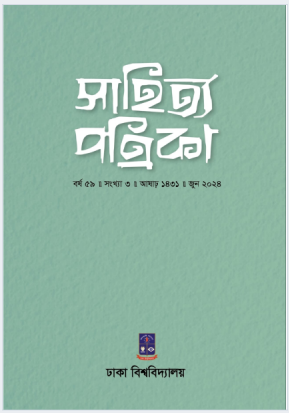

Vol. 59 | No. 3 | 2024

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

শামসুর রাহমানের রৌদ্র করোটিতে কাব্যে বোদলেয়ারের প্রভাব

Volume	59
Issue	3
Year	2024
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Sohana Mahboob
Published online	April 30, 2025
DOI	10.62328/sp.v59i3.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v59i3.2
Pages	29-52
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ

সাহিত্য পত্রিকা

Journal.bangla.du.ac.bd
Print ISSN: 0558-1583
Online ISSN: 3006-886X
বর্ষ: ৫৯ সংখ্যা: ৩
আষাঢ় ১৪৩১॥ জুন ২০২৪
প্রকাশকাল: এপ্রিল ২০২৫
Issue DOI: 10.62328/sp.v59i3

DOI: 10.62328/sp.v59i3.2
প্রবন্ধ জমাদান: ০৩ জুন ২০২৪
প্রবন্ধ গৃহীত: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪
পৃষ্ঠা: ২৯-৫২

শামসুর রাহমানের *রৌদ্র করোটিতে* কাব্যে বোদলেয়ারের প্রভাব

সোহানা মাহবুব
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল: sohanamahb@du.ac.bd

সারসংক্ষেপ

পঞ্চাশের দশকের কবি শামসুর রাহমান তাঁর *রৌদ্র করোটিতে* কাব্যে জীবনবোধের উচ্চারণে, আত্মপ্রতিকৃতি নির্মাণে, নগরজীবন রূপায়ণে এবং প্রতীক-উপমা-শব্দানুষঙ্গ ব্যবহারে অনন্য। এ ক্ষেত্রে কাব্যজীবনের প্রথম দিকে তিনি আধুনিক কবিতার পুরোধা বোদলেয়ার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। পশ্চিমি কবিদের নগরচেতনা, নেতিবাদ ও সৌন্দর্যভাবনা এবং তিরিশি কবিদের কবিতা পঠনপাঠন-জাত আধুনিকতার বোধ বাংলাদেশের পঞ্চাশ-ষাট দশকের কবিদের আপ্লুত করে। সেই সঙ্গে নির্মীয়মাণ ঢাকার আধা পুঁজিবাদী, আধা সামন্তবাদী সমাজ ও মানুষ, সমাজের অবক্ষয়, এলিট শ্রেণি এবং ছিন্নমূল মানুষের প্রবল অর্থনৈতিক ব্যবধান, পঞ্চাশ-ষাট দশকের রাষ্ট্রনৈতিক অস্থিরতাও তাঁদের কাব্যমানসে নিদারুণ এক অভিঘাতের জন্ম দেয়। শামসুর রাহমান তাঁর প্রথম দিকের কাব্যে অন্তর্ঘাতময় সময়ের এই স্বরকে ধারণ করেছেন। কবির *প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* এবং *রৌদ্র করোটিতে* কাব্যের কবিতাগুলোতে সমকালীন এই অন্তর্ঘাতের চিহ্ন ছড়িয়ে আছে বিচিত্র মাত্রায়, যে মাত্রা নির্মাণে তিনি পাশ্চাত্যের কবি বোদলেয়ারের কাব্যচেতনা দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত হন। রাহমান কোন পটভূমি ও পরিপ্রেক্ষিতে বোদলেয়ারের কাব্যবোধ আত্মস্থ করলেন এবং তাঁর মানসচেতনায় গভীরভাবে ধারণ করলেন, সে বিষয়টির উন্মোচনই বর্তমান প্রবন্ধের অন্বিষ্ট।

মূলশব্দ

পঞ্চাশ-ষাট দশকের কবিতার প্রেক্ষাপট, বোদলেয়ার, শামসুর রাহমান, বিচ্ছিন্নতা, ফ্লনিয়র, ঢাকা নগর, বিষাদ-বিতৃষ্ণা-নির্বেদ।

পঞ্চাশের দশকের শক্তিমান কবি শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬)। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* (১৯৬০) কাব্যে তিনি ছিলেন আত্মমগ্ন, স্বপ্নচারী এবং সৌন্দর্যপিপাসু। পরবর্তীকালে *রৌদ্র করোটিতে* (১৯৬৩) কাব্যে মৃত্যু-আচ্ছাদিত, আত্মমগ্ন কবি মানস-বিবর থেকে বেরিয়ে এলেন রৌদ্রালোকিত ঢাকার কোলাহলময় প্রতিবেশে। সমকালীন রাজনৈতিক চেতনা, চিরপরিচিত নগরের জীবনাচরণ এবং তাঁর পঠনপাঠন *রৌদ্র করোটিতে* কাব্যের স্বর পাল্টে দিল। সামরিক জান্তার বিরূপ শাসন, নির্মীয়মান ঢাকার আধা-সামন্ত আধা-পুঁজিবাদী আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক অসংগতি উক্ত কাব্যে উচ্চকিত করে তোলে এক নেতিবাদী বোধ। *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* কাব্যগ্রন্থের নেতিবাদী আউটসাইডার সত্তা থেকে *রৌদ্র করোটিতে* কাব্যে তিনি উত্তরিত হলেন দ্রষ্টা সত্তায়। আজন্ম-পরিচিত ঢাকার পথে হেঁটে হেঁটে তিনি দেখলেন নবোদ্ভূত এলিট মানুষের উন্নাসিক মনোভঙ্গি, তাদের অনৈতিক-অসংগতিপূর্ণ জীবনাচরণ, সুবিধাবাদী রাজনৈতিক সত্তার ঘৃণ্য প্রকাশ; বিপরীতে উপলব্ধি করলেন ছিন্নমূল মানুষের অর্থনৈতিক দুর্দশা, প্রবল দারিদ্র্য, প্রাত্যহিক জীবনের নরক-যাপন, পাপ ও পঙ্কিলতায় ঠাসা জীবনের বিভীষিকা এবং সেই সঙ্গে অনুভব করলেন তাদের অচরিতার্থ সৌন্দর্য-স্বপ্নচারিতা এবং ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষার যন্ত্রণা। সদ্য গড়ে ওঠা নগরস্বভাবী ঢাকা, তৎকালীন রাষ্ট্রযন্ত্রের স্বৈরাচারী রূপ, নগর-মানুষের জীবন-মৃত্যু-দুঃখ-বেদনা-ক্লেদ-পচন ও সৌন্দর্যবোধের বৈপরীত্য এবং মূল জনস্রোত-বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ কবির বিষাদ-বিতৃষ্ণা ও নির্বেদ—জীবনকে উপলব্ধি করার বিচিত্রমাত্রিক এই দৃষ্টিকোণের কারণেই *রৌদ্র করোটিতে* কাব্যে যুক্ত হলো নেতিবাদী অনুষঙ্গ। কোনো কোনো সমালোচক মনে করেন, শুধু রাহমানই নয়, বরং, পঞ্চাশ-ষাটের কবিদের নেতিবাচক অনুষঙ্গ ব্যবহারের এই প্রবণতা এবং তাঁদের প্রবল নগরচেতনা মূলত পশ্চিমা কবি এবং কলকাতার তিরিশি কবিদের কবিতাপাঠের ফল। এ ক্ষেত্রে পশ্চিমা কবি শার্ল পিয়েরে বোদলেয়ার (১৮২১-১৮৬৭) এবং টি. এস. এলিয়টের (১৮৮৮-১৯৬৫) কথা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। বর্তমান প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য শামসুর রাহমানের *রৌদ্র করোটিতে* কাব্যে বোদলেয়ারের কবিতার নেতিবাদ, কাব্যানুষঙ্গ এবং ভাবাদর্শের প্রভাব অন্বেষণ।

শামসুর রাহমানের কবিতায় বোদলেয়ারের প্রভাব সম্পর্কে কোনো কোনো সমালোচক তাঁদের লেখায় বেশ কিছু আলোকপাত করেছেন। হুমায়ুন আজাদ তাঁর *শামসুর রাহমান: নিঃসঙ্গ শেরপা* গ্রন্থে আধুনিক কবিতার জন্মের সঙ্গে ইউরোপের বহু ভাষার কবিতা ও কাব্যান্দোলন জড়িয়ে থাকা প্রসঙ্গে বোদলেয়ারের অশুভ নগরের কথা লিখেছেন। তাঁর মতে বোদলেয়ারের যেমন প্যারিস, রাহমানের কাছে তেমন কিংবদন্তীর নগর ঢাকা। তবে, এ বিষয়ে তিনি বিস্তৃত বিশ্লেষণ করেননি। *ত্রৈমাসিক পত্রিকার* শামসুর রাহমান সংখ্যায় সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম তাঁর 'শামসুর রাহমানের শহর' শীর্ষক প্রবন্ধে আধুনিক কবিতা ও নগর প্রসঙ্গে শামসুর রাহমানের ওপর বোদলেয়ারের প্রভাব বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। অন্যত্র, খোন্দকার আশরাফ হোসেন *কবিতার অন্তর্যামী: আধুনিক উত্তরাধুনিক ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* গ্রন্থের 'শামসুর রাহমান: সূর্যকান্ত জীবনের কবি' প্রবন্ধে রাহমান যে বোদলেয়ারের হাত ধরে কৃমিকীট, ব্যাধি, পতন-পচনের এক যন্ত্রণাময় নগরের মুখোমুখি হয়েছেন এবং ক্রমান্বয়ে নগরচারী হয়ে উঠছেন, এবং সেটি যে এক ধরনের অনুকৃতি, সে বিষয়টির ওপর জোর দিয়েছেন। তবে

তিনি মনে করেন, *রৌদ্র করোটিতে* কাব্যের শেষের কয়েকটি কবিতা ছাড়া বোদলেয়ারের তেমন প্রভাব এ কাব্যে নেই। বেগম আকতার কামালের *শামসুর রাহমানের কবিতা অভিজ্ঞান ও সংবেদ* গ্রন্থের 'রৌদ্র করোটিতে: নশ্বর-অনশ্বরের প্রতিন্যাস' প্রবন্ধে পাপের অতলে তলিয়ে সৌন্দর্য অনুসন্ধিৎসায় শামসুর রাহমানের ওপর বোদলেয়ারের প্রভাব রয়েছে বলে আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়া বায়তুল্লাহ্ কাদেরীর *বাংলাদেশের ষাটের দশকের কবিতা: বিষয় ও প্রকরণ* গ্রন্থেও এ প্রসঙ্গে কিছুটা আলোকপাত আছে। অন্যত্র, বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত *শামসুর রাহমান স্মারকগ্রন্থের* প্রবন্ধগুলোতেও এ প্রসঙ্গে কোনো কোনো সমালোচক আলোচনা করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধে 'শামসুর রাহমানের *রৌদ্র করোটিতে* কাব্যে বোদলেয়ারের প্রভাব' প্রসঙ্গে পূর্ণাঙ্গ একটি রূপরেখা নির্মাণের প্রচেষ্টা বিদ্যমান। কবির নিঃসঙ্গতা, তাঁর আমিত্ববোধ এবং বিচ্ছিন্নতা, পিছুটানহীন দ্রষ্টাসত্তা, পতন-পচনময় যন্ত্রণাক্লীষ্ট নগরচিত্র, ইতি-নেতির দ্বন্দ্বাত্মক সৌন্দর্যবোধ এবং বিষাদ-বিতৃষ্ণা ও নির্বেদ—*রৌদ্র করোটিতে* কাব্যের এই বিষয়গুলোর ওপর এই প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। তুলনামূলক গবেষণাপদ্ধতি এবং বিশ্লেষণাত্মক পরিচর্যারীতির মাধ্যমে প্রবন্ধটির গবেষণাকর্ম পরিচালিত হয়েছে।

১

শামসুর রাহমান চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকের পূর্ববাংলার কবিতা প্রসঙ্গে আলোকপাত করতে গিয়ে সমকালীন কবিদের লেখায় পাশ্চাত্য কবিতার প্রভাবপুষ্ট তিরিশি কবিদের কাব্যাদর্শের অনুরণন লক্ষ করে মন্তব্য করেন:

> মহাযুদ্ধ শুধু ইউরোপের সমাজ-মানসকেই বিধ্বস্ত করেনি, সারা পৃথিবীর ভিত নড়ে উঠেছে যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতিতে। হতাশায় কালো হয়ে গেছে মানুষ। জীবনের বিভিন্ন দিকের প্রচলিত সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছে মার্কস-ফ্রয়েড-পড়া দুই যুদ্ধের মাঝখানে গঠিত মন। তাই তিরিশি কবিদের কাব্যে ধরা পড়েছে এই সময়ের বিষণ্নতা, হতাশা আর ধূসরতা। (শামসুর ১৯৯১: ২৭৯)

তিরিশি কবিদের নগরকেন্দ্রিক কবিতায় সময়ের বিষণ্ন-হতাশ-ধূসর কণ্ঠ পাশ্চাত্য কবি শার্ল পিয়েরে বোদলেয়ার (১৮২১-১৮৬৭), টি. এস. এলিয়ট (১৮৮৮-১৯৬৫) কিংবা জেমস জয়েসের (১৮৮২-১৯৪১) মতো পাশ্চাত্য সাহিত্যিকদের রচনা পঠনপাঠন-সূত্রে অন্বিত। ১৯২১ সনে নলিনীকান্ত গুপ্ত প্রথম *সবুজপত্র* পত্রিকায় 'ফরাসি কবি বোদলেয়ার' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। এর ২৯ বছর পর ১৯৫০ সনে নির্মলকুমার চট্টোপাধ্যায় *প্রবাসী*তে 'ফরাসি কবি শার্ল বোদলেয়ার ও তাঁর কাব্য প্রতিভা' শীর্ষক আরো একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধ ছাড়াও ১৯১০ সনে *তীর্থরেণু* কাব্যগ্রন্থে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের হাতে বাংলা ভাষায় প্রথম বোদলেয়ারের কয়েকটি কবিতা অনূদিত হয়। তবে, বাঙালি কবিদের অনুপ্রাণিত করার বিষয়ে বুদ্ধদেব বসুর অবদানই সবচেয়ে বেশি বলে অনুমান করা যায়। *শার্ল বোদলেয়ার: তাঁর কবিতা* এই নামে বুদ্ধদেব বসু ১৯৬১ সনে টীকাসহ অনুবাদ করেন বোদলেয়ারের কাব্য। প্রবলভাবে রোমান্টিক বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্র-কাব্যদর্শনের বিশুদ্ধ সৌন্দর্যতত্ত্বে যুক্ত করেন বোদলেয়ারের

কাব্যাদর্শ-প্রসূত 'ক্লেদজকুসুমের নন্দনতত্ত্ব'। *রৌদ্র করোটিতে* কাব্যের বেশ অনেকগুলো কবিতায় বোদলেয়ারের এই নন্দনতত্ত্বের প্রভাব অনুভূত হয়।

আধুনিক কবিতার পুরোধা পিয়েরে বোদলেয়ার ক্লাসিক এবং রোমান্টিক কবিতার ভেদ লুপ্ত করে এবং কাব্যে সৌন্দর্যবোধের নতুন মাত্রা যুক্ত করে বিংশ শতাব্দীর কবিতায় আবির্ভূত হন। তাঁর কাব্যাদর্শ পূর্ববর্তী কবিদের তুলনায় অভিনব ছিল, যে কাব্যাদর্শের উৎস হিসেবে ফ্রান্সে বোদলেয়ারের জন্মপূর্ব ও পরবর্তী কালকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। বোদলেয়ারের জন্মের পূর্বে ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট শিল্পনির্ভর পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, বুর্জোয়া শ্রেণির উত্থান, ধনতান্ত্রিক অভিজাত শ্রেণির ওপর আঘাত, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের জন্ম, রাজায় রাজায় সংঘাতের রাষ্ট্রীয় পর্বান্তর, গিলোটিনে প্রকাশ্য হত্যাকাণ্ড, ১৮৩২ সালে সৃষ্ট কলেরা মহামারীকেন্দ্রিক গণকবর, মৃত্যুর মিছিল, মড়াপোড়া, বাবুবিলাস বা ড্যান্ডিবাদ, কার্নিভাল এবং ফ্রান্সের রাষ্ট্রনৈতিক এবং আর্থসামাজিক অবস্থা সমকালীন সাহিত্যগোষ্ঠীর ভেতর প্রচলিত রীতিনীতি ভাঙার তাগিদ তৈরি করে। ১৮২৯ সালের দিকে ফরাসি লেখক পেত্রুস বোরেল (১৮০৯-১৮৫৯), কবি থিয়োফিল গোতিয়েঁ (১৮১১-১৮৭২), নের্ভাল (১৮০৮-১৮৫৫) এবং অন্যান্য তরুণ কবি একটি সাহিত্যগোষ্ঠী নির্মাণ করেন, যার নাম ছিল 'ল্য পেতী সেনাকল'। এঁদের ওপর বায়রন (১৭৮৮-১৮২৪) এবং ওয়াল্টার স্কটের (১৭৭১-১৮৩২) দুর্মর প্রভাব ছিল। এঁদের আড্ডার নাম ছিল 'তাতার শিবির' এবং গোষ্ঠীর নাম 'তরুণ ফ্রান্স'। সাহিত্যাদর্শে এঁরা ছিলেন চরমপন্থী, মৃত্যু-হত্যা-শবসাধনার মতো উদ্ভটের সাধক। সমকালীন প্যারিসের কিছু চিত্রে বিষয়গুলো অনুভূত হবে:

ক. 'তরুণ ফ্রান্স' নিজেদের ঘোষণা করলেন লুই-ফিলিপের ও ফিলিস্টাইনদের শত্রু ব'লে; সমাজের কোনো শাসন তাঁরা মানবেন না, সব প্রথা ভাঙবেন। একটিমাত্র ঘর, আসবাব অল্প, কিন্তু আভরণের বৈশিষ্ট্য বিস্ময়কর; সভ্যেরা মধ্যযুগীয় পোশাক প'রে মেঝেতে ব'সে, করোটিতে সুরাপান করেন। এই ফ্যাশানের প্রবর্তন করেন লর্ড বায়রন, ফ্রান্সে সেটি চরমে নিয়ে যান নের্ভাল, যিনি একটি করোটি হাতে ক'রে রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়ে শ্লথভাবে ঘোষণা করতেন যে এটি তাঁর বাবার (অথবা মা-র) মাথার খুলি, সংগ্রহ করার জন্য হত্যা করতে হয়েছিলো। (বুদ্ধদেব ২০১৫: ২১৭)

খ. বরেল গোষ্ঠী, বাবুবিলাস, তার উপরে কার্নিভাল ও কলেরা সাহিত্য হ'য়ে উঠলো 'মড়াপোড়া কাব্য', অর্থাৎ হত্যা, আত্মহত্যা, রক্ত, শবধর্ষণ, কঙ্কাল ও শয়তানের মিছিল। ... এ সবই বীজ, 'লে ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এর জমিকে তৈরি ক'রে তুলেছে। (বুদ্ধদেব ২০১৫: ২২০)

গ. সবচেয়ে বৃহৎ, উজ্জ্বল ও উদ্দাম কার্নিভালের অনুষ্ঠান ঘটে রেনেসাঁসের সময় ফ্লরেন্সে, ভেনিসে তারপর লুই-ফিলিপের প্যারিসে। ১৮৩২-এর কার্নিভাল আকারে ও উন্মাদনায় অন্যগুলিকে হার মানিয়ে দেয়: সারা প্যারিস পথে বেরিয়েছে ভোর থেকে, শহরের উপর ঝাঁকে-ঝাঁকে নেমেছে চোর, গুন্ডা, বেশ্যা, লম্পট ও ভিখিরি, আর তাদের মধ্যে, শৌখিন-ছদ্মবেশের সুযোগে চক্ষুলজ্জা খসিয়ে ফেলে, অবাধে মিশে যাচ্ছেন সম্ভ্রান্ত পুরষ ও মহিলারা। ... সার্থকনামা 'নারকী নাচে' (le galop infernal) মত্ত হ'য়ে রাত্রিশেষে ললনাকুল মূর্ছা গেলেন। ... কলেরা নামলো। প্রথম নামলো এক প্রমোদশালায়; একদল

> নাচিয়েকে, মুখের রঙ আর সাজগোজসুদ্ধ, নামাতে হ'লো কবরে। কয়েকদিনের মধ্যেই মৃত্যুর এক অপরূপ লীলা দেখতে পেলো প্যারিসবাসীরা। রাস্তায়, যে-কোনো সময়ে সারি-সারি কফিন-টানা গাড়ি চলেছে, ... তরুণ লেখকরা সন্ধ্যার পর হাসপাতাল ঘুরে-ঘুরে বেড়ান, মৃত্যুর দৃশ্যে মন ভ'রে নিয়ে উগোর বাড়িতে এসে আড্ডা জমান, লিসট বাজিয়ে শোনান বেটোফেনের 'শবযাত্রা'। মার্চ থেকে নবেম্বরের মধ্যে কুড়ি হাজার মানুষ মরলো। ফলত মৃত্যু যেন খুব বেশি চেনা হ'য়ে গেলো ফরাসিদের, প্রায় প্রিয়জন। আত্মহত্যার সংখ্যা বাড়লো, তার সমর্থন ক'রে এক সাহিত্যিক লিখলেন: তৃষ্ণানিবারণের জন্য সুরাপান করি আমরা; আসলে মৃত্যুকেই পান করি। (বুদ্ধদেব ২০১৫: ২২০-২২১)

সমকালের এই নেতির প্রভাব বোদলেয়ারের কাব্যে শুদ্ধ-সৌন্দর্যবোধের সংজ্ঞার্থ পালটে দেয়। ছিন্নমূল-ক্লিন্ন মানব-অস্তিত্বসংবলিত শিল্পিত নগরের ভাষ্যনির্মাণে, এনিগমাটিক নারীভাবনায়, নেতিবোধের গাঢ় প্রকাশে, বিষাদ-বিতৃষ্ণা-নির্বেদগ্রস্ত আত্মার স্বরূপ রচনায় বোদলেয়ারের কাব্য সমকালে অভিনব। বোদলেয়ার তাঁর কাব্যভাবনায় কেন শুধু নেতিকেই বেছে নিলেন, এর বিশ্লেষণে আবু সয়ীদ আইয়ুব মন্তব্য করেন:

> তাঁর একটি মৌল প্রত্যয় ছিল যে, পাপের পথেই তিনি বুঝবেন বিশ্বজগৎ কত ন্যক্কারজনক এবং সে-ন্যক্কারবোধ যত দৃঢ় ও ব্যাপ্ত হবে ততই ভগবানকে কাছে পাবেন তিনি। ... বোদলেয়ার জগতের কালিমাই দেখলেন কারণ শুধু তাই দেখবেন বলে মনস্থির করেছিলেন। যা-কিছু শুভ্র সমুজ্জ্বল ও আনন্দময় তা তাঁর ক্যাথলিক বিশ্বাসমতে তাঁকে পথভ্রষ্ট করবে এই ভয়ে সে-দিক থেকে তিনি মুখ ফেরালেন জন্মের মতো, যেন ডান চোখটি নিজের হাতেই কানা করে ফেললেন। ... বাঁ-চোখ দিয়ে দেখতে পেলেন প্রকৃতি ও নারী—কাব্যের দুই চিরন্তন অফুরন্ত বিস্ময় ও রহস্য—উভয়ই ঘৃণ্য ('abominable'); মানুষ, অধিকাংশ মানুষ কশাঘাতের যোগ্য (most of humanity was created for the whip)। (আবু সয়ীদ ২০১৬: ২৩)

শুভ্র-সমুজ্জ্বল ও আনন্দময় বোধ থেকে মুখ ফিরিয়ে ঘৃণ্য, অশুভ জীবনবোধের কবি হয়ে উঠলেন বোদলেয়ার। *প্যারিস স্প্লীন*-এর 'শেষের কথা' (Epilogue) কবিতায় তাঁর নগরচেতনা, ঈশ্বরভাবনা এবং নারীচেতনার স্বরূপ উপলব্ধ হবে:

> ... আমি উঠেছি পাহাড় চূড়ায়,
> এখান থেকে দেখা যাবে পুরোপুরি ওই শহরটা
> হাসপাতাল, বেশ্যাপাড়া, শোধনস্থান নরক, কয়েদখানা,
>
> যেখানে সব উদ্ভটেরাই ফুটে ওঠে এক ফুলের মতো।
> তুমি তো ভালোই জানো, ও শয়তান, আমার যন্ত্রণার ধাইমা,
> আমি ওখানে যাব না বৃথা অশ্রু ঝরাতে,
>
> কিন্তু বৃদ্ধ নগরীর বৃদ্ধ লম্পটের মতো
> আমি নিজেকে মাতিয়ে তুলতে চেয়েছি বিপুলা বেশ্যায়,
> যার নারকীয় মোহ নিত্য নব যৌবন দেয়।
>
> ... ...

আমি তোমায় ভালোবাসি ও কুখ্যাত রাজধানী! বারাঙ্গনা
দস্যু, তোমরাও এমন সুখ বিলিয়ে থাকো
যা বোঝে না অভব্য ইতরেরা। (বোদল্যার ২০১৬: ১৮৩)

নগরচেতনা-বেশ্যাপাড়া-নরক-কয়েদখানা-কবরখানা-লাম্পট্য-ইতরতা-কুখ্যাতি-নারকীয় মোহ সেই সঙ্গে কঙ্কাল, করোটি, মৃত্যু, কবর, প্রেত, মড়কের আনাগোনা সব মিলিয়ে অশুভ বোধের কবি বোদলেয়ার। বোদলেয়ারের কালের এই অন্ধকার সময় তাঁর কবিতায় 'শুধু কুসুমে'র পরিবর্তে 'ক্লেদজকুসুম'কেই কেবল প্রস্ফুটিত করে। সমালোচকের ভাষায়:

> ফ্রান্সে ভিক্তর উগোর নেতৃত্বাধীন কবিদের মধ্যে এবং ইংলন্ডে লেক স্কুলের কবিগোষ্ঠীর রোম্যান্টিকতা ষোলোকলায় পূর্ণবিকশিত ছিল, তার অবসান ঘটল অমঙ্গলেরই প্রবল অভিঘাতে। ঘটালেন বোদলেয়ার। বোদলেয়ারকে বলা হয় প্রথম কাউন্টর রোমান্টিক এবং কাব্যে আধুনিকতার পথিকৃৎ। ... বাংলাদেশেও একজন কৃতী ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ এবং পরীক্ষানিরত বহু নবীন কবির পক্ষে 'এ কথাটা (কথাটা র‍্যাঁবোর) মেনে নেওয়া অত্যন্ত বেশি সহজ হয়ে গেছে যে তিনি (অর্থাৎ বোদলেয়র) "প্রথম দ্রষ্টা, কবিদের রাজা, সত্য দেবতা"। (আবু সয়ীদ ২০১৬: ১৯-২০)

প্রশ্ন থেকে যায় বোদলেয়ারের কালের এই আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতের মতো শামসুর রাহমান বা তাঁর সমকালীন কবিদের আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতের কী সাযুজ্য ছিল, যার প্রভাবে তাঁদের কবিতায় নগর ও নগরজীবনের ক্লেদ-পতন-বিসংগতির চিত্র অন্বিষ্ট হলো! নাকি, পাশ্চাত্য কবিদের কাব্যাদর্শ পঠনপাঠন-জনিত এই দুর্মর প্রভাব। মূলত, পঞ্চাশ দশকের উত্তাল রাজনৈতিক পট, আইয়ুব সরকারের স্বৈরতন্ত্র, বাঙালির দ্রোহী সত্তার উন্মাতাল ক্ষোভ এবং শাসকের স্বৈরাচারী সত্তার বীভৎসতা প্রকাশে এ কালের কবিতায় নেতিবাদী অনুষঙ্গ প্রযুক্ত হয়েছে। শামসুর রাহমানের প্রথম পর্বের কবিতাও এর ব্যতিক্রম নয়। সমালোচক মনে করেন, এ কালের কবিতায় এইসব শব্দানুষঙ্গ ব্যবহারের কারণ সমকালীন আশাহীনতা:

> কবিতার মধ্যকার অবক্ষয়, নৈরাশ্য, হাতাশা আর আশাভঙ্গতার সঙ্গে সমকালীন রাজনৈতিক-রাষ্ট্রনৈতিক অবরুদ্ধতা, পূর্ববাংলাকে অর্থনৈতিকভাবে শোষণ, পূর্ববাংলার শিক্ষিত তরুণদের বেকারত্ব, চাকরিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে জাতিগত বৈষম্য, চারদিকে অনেক পূর্বসূরির পাকিস্তানি শাসকচক্রের কাছে নির্লজ্জ আত্মবিক্রয়, পূর্ববাংলার রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে পারস্পরিক অনৈক্য ও রেষারেষি ইত্যাকার নানা বিষয়ের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। ... একজন লেখক কী নিয়ে লিখবেন তারও ফিরিস্তি পাকিস্তানের অখণ্ডতার নামে লেখকদের প্রায়শই আইয়ুব খানের স্বৈর সরকারের পক্ষ থেকে ঠারেঠোরে বলে দেওয়া হতো। ... এসব কারণে ষাটের তরুণ কবিকুল সর্বৈব নাস্তিকে, নৈরাশ্য, হতাশা আর অবক্ষয়কে আলিঙ্গন করেছেন। এই নাস্তি, নৈরাশ্য, হতাশা, আশাভঙ্গতা আর অবক্ষয় প্রকাশের মধ্যে ছিল তীব্র দহন এবং দ্রোহী চেতনা। (কুদরত ২০২২: ২১১-২১২)

পঞ্চাশের শুরুর দিকের কবিদের ওপর ত্রিশের কলকাতার কবিতার একটা স্বল্পকালীন প্রভাব ছিল। কারণ ঢাকা তখনও সর্বার্থে একটি উঠতি নগর বলেই কলকাতার একটা দুর্মর প্রভাব ঢাকার ওপর ছিল। 'পঞ্চাশ-এর এবং ছয়ের দশকের কবিবর্গের যৌথ কাব্যভাবনা,

চেতনাপ্রবাহ ও জীবনদর্শনে এবং তাঁদের চিত্রকল্প-উপমা-রূপক-প্রতীক নির্মাণের অস্থিরতায়, অবজ্ঞায়, অবিশ্বাসে, অভিনবত্বে আমাদের বন্দীচেতনা-স্রোত বিধৃত' (সৈয়দ আকরম ১৯৮৫: ৪২) এবং 'বোদলেয়ারের কবিতার অবক্ষয় যেমন তাঁর সমকালের স্বদেশের অবক্ষয়ের শিল্পভাষ্য, তেমনি ষাটের তরুণ কবিদের কবিতাও স্বকালের স্বদেশের বিনষ্টি, অপচয় আর অবক্ষয়ের সঙ্গে যুক্ত' (কুদরত ২০২২: ২১৩-২১৪)। বাংলাদেশের কবিতায় স্বল্পকালীন হলেও অস্থির সময়ের কণ্ঠস্বর হিসেবে অন্বিত হলো বোদলেয়ারের 'কদর্যের নন্দনতত্ত্ব'।

বাংলাদেশের কবিদের কাছে বোদলেয়ারকে প্রথম দ্রষ্টা, 'কবিদের রাজা' আর 'সত্য দেবতা'র অভিধায় পরিচয় করিয়ে দিলেন বুদ্ধদেব বসু। বোদলেয়ারের নগরচারিতা এবং নেতিনাস্তিবাদ এ কালের কবিদের অন্বিষ্ট হয়ে উঠল। খোন্দকার আশরাফ এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন:

> বোদলেয়ারের কবিতার অনুষঙ্গসমূহ যেমন করোটি, শব, অন্ধকার, পচন ও বিবমিষা প্রবেশ করল কবিদের চেতনায়। ফরাসি প্রতীকবাদীদের কবিতার কেন্দ্রে ছিল নগরচারিতা; অবাস্তব শহরে নাটকীয় যাত্রায় তাঁরা উদভ্রান্তি, নিঃসঙ্গতা, ভয়কে প্রখরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। নগরচিত্র এলিয়টের কাব্যেরও একটি মূল সার, কিন্তু শহরজীবনের চিত্রকল্প প্রথম ব্যবহার করেছেন বোদলেয়ার, করবিয়ের, র‍্যাবোঁ, লাফর্গ প্রভৃতি ফরাসি সংকেতবাদীগণ। নগরচেতনা আধুনিক বাংলা কবিতারও একটি কুললক্ষণ; এই কালে নগরচেতনা দ্বারা সবচেয়ে বেশি স্পৃষ্ট হয়েছেন শামসুর রাহমান। ... শামসুর রাহমানের প্রথম-পর্বের কবিতায় বোদলেয়ার এক জ্বলন্ত অনুপ্রেরণা। বোদলেয়ারের সূর্য যেমন 'পালক পিতা, পাণ্ডুতার শত্রু তার তাপে/ নিরপেক্ষ উজ্জীবন ঝরে পড়ে গোলাপে/ দুশ্চিন্তা উবিয়ে দেয় উন্মীলিত নীলিমার দিকে', তেমনি শামসুর রাহমানের বোদলেয়ারের সর্বময় উপস্থিতি। ... 'রৌদ্র করোটিতে' কাব্যের বিবিধ কবিতায় বোদলেয়ারের প্রভাব—নাগরিক বিসংগতিবোধ, ক্লেদ, হতাশা, বুভুক্ষা ও মদিরাকামনা ইত্যাদি অনুষঙ্গ ... (খোন্দকার আশরাফ ১৯৯৪: ২৩-২৫)

শামসুর রাহমান বোদলেয়ারের প্যারিসের মতোই ঢাকাকে ভালোবাসতেন। তাঁর একাধিক কবিতা নগরকেন্দ্রিক। একান্ত ভাবনায় ফুটে ওঠে তাঁর ঢাকা-প্রেম:

> দীর্ঘকাল ঢাকা শহরে আছি। এই বাক্যটি লিখতে আমার মাত্র কয়েক সেকেন্ড লেগেছে। কিন্তু এর শরীরে আছে প্রচুর ধুলো, হাওয়া, রৌদ্র, জ্যোৎস্না, ভেজা মাটির গন্ধ, ঘাসের স্পর্শ, ঘোড়ার গাড়ির শব্দ, বিস্কুটের টক টক ঘ্রাণ। এই বাক্যে রয়েছে পাখির গান, বাড়ি ফেরার টান, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে-বেড়ানোর নেশা, গলির অন্ধকার-অন্ধকার নেশা, হৈহল্লা। ... আমার মনের ভেতরে সময় সময় এই শহর এক অর্কেস্ট্রা হয়ে যায়। ... এই যে আমি আজ আমার নিজস্ব ধরনে গড়ে উঠেছি—এর পেছনে ঢাকার অবদান অনেকখানি। (শামসুর ২০০১: ২২০)

তবে, ঢাকার বিশুদ্ধ সৌন্দর্যকেই যে তিনি একচেটিয়া ভালোবেসেছেন বিষয়টি তেমন নয়, বরং বোদলেয়ারের মতো এই নগরের নোংরামি-কুশ্রীতা, হিংসা-লালসাকেও তিনি সেই সৌন্দর্যের সাথে যুক্ত করেই গ্রহণ করেছেন। বোদলেয়ার 'রাজহাঁস' কবিতায় প্যারিসের প্রতি যেমন কামনা করেছেন, 'প্যারিস নূতন হোক! অবিকল আমার বিষাদ!', প্রিয় ঢাকাকেও শামসুর রাহমান নিজের সত্তার অংশ হিসেবে অনুভব করেছেন। সমালোচকেরা মনে করেন, পঞ্চাশের কবিদের নগরভাবনায় বোদলেয়ারের প্যারিস, এলিয়টের লন্ডন, জেমস জয়েসের

ডাবলিন এবং জীবনানন্দের কলকাতার মিশেলে ঢাকা হয়ে ওঠে এক পরাবাস্তব নগর, যে নগর কসমোপলিটন হয়ে ওঠার সাধনায় আত্মস্থ করে নেয় এর জনজীবনসম্ভূত ক্লান্তি, বিষণ্নতা, নৈঃসঙ্গ্য এবং নির্বেদ। রাহমানের ঢাকাও এই রকম এক নগরের আদল পেল *রৌদ্র করোটিতে* কাব্যে।

২

রৌদ্র করোটিতে কাব্যে ঢাকার জনজীবনের যে চিত্র মেলে, সে জীবন যেন বোদলেয়ারের *প্যারিস-চিত্র* সমতুল্য। 'স্বগত ভাষণ' কবিতার সঙ্গে বোদলেয়ারের 'বিতৃষ্ণা' কবিতার সাযুজ্য দেখিয়েছেন তরুণ মুখোপাধ্যায়। *রৌদ্র করোটিতে* কাব্যের কয়েকটি কবিতায় ছিন্নমূল মানুষের অস্তিত্ব বোদলেয়ারের *প্যারিস-চিত্র* কাব্যের 'সান্ধ্য প্রদোষ' কবিতার গণিকা, বেশ্যা, মাতাল, জোচ্চোর এবং চোরের মতো ব্যাধিগ্রস্ত দঙ্গলের কথা মনে করিয়ে দেয়। বোদলেয়ারের মতো শামসুর রাহমানও আধা-পুঁজিবাদী এই নগরে এদের মতো ব্যাধিগ্রস্ত মানব-মিছিলের দেখা পান, যারা বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়েও নিজেদের অবদমিত স্বপ্নাকাঙ্ক্ষায় উদ্‌বেল। যথাক্রমে বোদলেয়ার এবং শামসুর রাহমানের কবিতাদুটির উল্লেখ করা যেতে পারে:

> ইতিমধ্যে ব্যাধিগ্রস্ত দঙ্গল, সহসা
> গুরুভারে জেগে উঠে, শুরু করে দৈনিক ব্যবসা।
> খড়খড়ি কাঁপায় তারা, পরদা ছেঁড়ে, দরোজা ধাক্কায়;
> বাতাঘাতে উৎপীড়িত আলোকের অস্থির ছায়ায়
> রঙিন গণিকাবৃত্তি প্রজ্বলিত হ'লো ইতস্তত
> পথে-পথে, অবাধ পুরীষস্রাবী বল্মীকের মতো;
> খোলে সে নিগূঢ় গলি দিকে-দিকে;
> ... ...
> ক্লেদের নগর এই—তার বুকে চলে এঁকে-বেঁকে,
> যেমন শঙ্কিত কৃমি মানুষের চক্ষু থেকে ঢাকে
> খাদ্য তার। এদিকে ছ্যাঁকছ্যাঁকে শব্দে জাগে রান্নাঘর
> এখানে-ওখানে; অর্কেস্ট্রা উল্লসে; ওঠে তারস্বর
> রঙ্গমঞ্চে; আর সস্তা রেস্তোরাঁয়, যেখানে জুয়োর
> ফুর্তির উৎসাহ জমে, জোটে বেশ্যা, মাতাল, জোচ্চোর,
> তাদের সাকরেদ যত; জোটে চোর, পিশুনস্বভাবে
> প্রতিশ্রুত; অবিলম্বে সেও যাবে, সেও কাজে যাবে,
> মৃদু হাতে দরজা খুলে, বাক্স ভেঙে, হয়তো কুড়াবে
> দু-দিনের অন্ন তার, কিংবা উপপত্নীরে সাজাবে। ('সান্ধ্য প্রদোষ', বোদলেয়ার ২০১৬: ১০৭)

ব্যাধিগ্রস্ত-ক্লেদাক্ত দঙ্গলের এই নগর-চিত্র *রৌদ্র করোটিতে* কাব্যের 'স্বগত ভাষণ', 'খুপড়ির গান', 'ছুঁচোর কেত্তন' এবং 'পার্কের নিঃসঙ্গ খঞ্জ' কবিতায়ও চিত্রিত:

> ক. আমার মাথাটা যেন বহ্নিমান একটি শহর
> যেখানে মানুষ, যান, বিজ্ঞাপন, রেডিয়োর গান
> ভিখিরির চেঁচামেচি, বেশ্যার বেহায়া অনুরাগ,

কানাঘুষা, নামহীন, মৃতশিশু আবর্তিত শুধু। ('স্বগত ভাষণ', শামসুর ২০১৭: ২৫৬)

খ. এ-পাড়ায় ১৭টি উজবুক ৫ জন বোবা
৭টি মাতাল আর ৩ জন কালা বেঁচেবর্তে
আছে আজও দুর্দশার নাকের তলায়। মাঝে-মাঝে
দুর্লভ আঙুর চেয়ে কেউ-কেউ তারা বলে থাকে
'টক সব টক—তার চেয়ে তাড়ির ঝাঁঝালো ঢোক
ঢের ভালো, ভালো সেই গলির মোড়ে জ্বলজ্বলে
পানের দোকান আর বাইজির নাচের ঘুঙুর।' ('খুপরির গান', শামসুর ২০১৭: ২১৫)

গ. একটি প্রখর পাখি ঠুকরে ফেলে দেয় অবিরত
পোকা-খাওয়া মূল্যবোধ আমরা যে-যার মতো পথ চলি,
দেখি বুড়ো লোকটা পার্কের বেঞ্চে ব'সে হাঁপিয়ে, ফুঁপিয়ে
অভিশাপ ছুঁড়ে দেয়, গাল পাড়ে ভিখিরিকে আর
উল্কি-পরা সরু গলি চমকায় নগ্ন ইশারায়,
বেকার যুবক দৃষ্টি দ্যায় সিনেমার প্ল্যাকার্ডের
রঙচঙে ঠোঁটে, মুখে বুকে আর মদির উরুতে। ('ছুঁচোর কেত্তন', শামসুর ২০১৭: ২২০)

ঘ. নিজের ফাঁড়ার কথা ভেবে
একচ্ছত্র ক্ষুধার সাম্রাজ্যে ঘুরে ঘুরে
ধুলো ঘেঁটে ছাই ছেনে হৈ হৈ ছেলেদের
দৌরাত্ম্যে অস্থির
ফিরে আসে পার্কে এই নিরানন্দ বাদামের খোসা
ভবঘুরে কাগজের অভ্যস্ত জগতে
যেখানে অনামি
বাউণ্ডলে ময়লা ভিখিরি আর লম্পট জোচ্চোর
গণ্ডমূর্খ আর ভণ্ডমূর্খ আর ভণ্ড ফকির অথবা
অর্ধনগ্ন ভস্মমাখা উন্মাদিনী বেহেড মাতাল
এসে জোটে সন্ধ্যার আড়ালে ('পার্কের নিঃসঙ্গ খঞ্জ', শামসুর ২০১৭: ২২২)

উপর্যুক্ত কবিতাগুলোতে নাগরিক প্রতিবেশে যেসব আগন্তুক মানুষের দেখা মেলে, তাদের অধিকাংশই ছিন্নমূল, উদ্বাস্তু-অনিকেত মানবস্রোত। এদের ক্লান্তি, হতাশা, নৈরাশ্য, অবক্ষয় এবং জীবনযাপনের একঘেয়ে পুনরাবর্তনের 'এ চিত্র মূলত এবং প্রধানত বোদলেয়রের। ফলে ভিখিরি, বেশ্যা, জুয়াড়ি, রোগী একাকার। ... এসবের মধ্যে বসবাস করে আধুনিক মানুষের "অ্যাবসার্ড" অস্তিত্ব' (গাউসুর, ২০১০: ৭৪)। এই মানুষগুলোকে শামসুর রাহমান তাঁর *রৌদ্র করোটিতে* কাব্যে দেখেছেন পুঁজিবাদী সমাজের বিপরীত শ্রেণি হিসেবে। তাদের দীর্ঘশ্বাস, হতাশা, ক্রোধ এবং অবদমিত আকাঙ্ক্ষার ক্ষোভ অনুভব করেছেন পথে হেঁটে হেঁটে। তাঁর সেই দ্রষ্টা সত্তা ভিড়ের এই নগরে পিছুটানহীন, তাড়নাহীন অভিব্যক্তিতে উদ্ভাসিত। নগরে পরিভ্রমণরত এই মানুষটি সকল সম্পর্ক থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে নৈঃসঙ্গ্যের ঘেরাটোপে বন্দি।

৩

রৌদ্র করোটিতে কাব্যে নিরাসক্ত ভঙ্গিতে পরিভ্রমণরত ব্যক্তি মনস্তাত্ত্বিক এবং আর্থসামাজিক শ্রেণিশোষণের অংশী। এই কাব্যে মূল জনস্রোতবিচ্ছিন্ন মানুষটি কবির প্রতিরূপ। এ ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রসঙ্গে কিছু আলোকপাত করা প্রয়োজন। সমাজ-দার্শনিকদের মধ্যে জ্যঁ জ্যাক রুশো (১৭১২-১৭৭৮), হেগেল (১৭৭০-১৮৩১), ফয়েরবাখ (১৮০৪-১৮৭২), হার্বার্ট মারকিউস (১৮৯৮-১৯৭৯), জর্জ লুকাচ (১৮৮৫-১৯৭১) তাঁদের ব্যাখ্যাসূত্রে বিচ্ছিন্নতা নিয়ে নানা মতবাদ প্রদান করেন। তবে কার্ল মার্কসই (১৮১৮-১৮৮৩) প্রথম মনস্তাত্ত্বিকতার বেড়াজাল থেকে বিচ্ছিন্নতাকে মুক্তি দিয়ে একে আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক শ্রেণিশোষণের পটভূমিতে দেখতে চেষ্টা করেন। মার্কস মনে করেন, মানুষ তার সৃষ্ট উপাদান বা শ্রমজাত ফসল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার কারণে তার ভেতর এলিয়েনেশন বা বিচ্ছিন্নতার জন্ম হয়। তিনি মনে করেন, 'The worker becomes an ever cheaper commodity the more commodities he creates' (Marx 1977: 68)। নিজের কর্মপদ্ধতি, শ্রমফসল, নিজ সত্তা এবং সামাজিক সম্পর্কস্রোত থেকে এভাবেই মানুষ ক্রমশ বিচ্যুত হয়ে পড়ে। মার্কসের মতো জাঁ পল সার্ত্রে (১৯০৫-১৯৮০) মনে করেন, শ্রম-বিচ্ছিন্নতা এবং পুঁজিবাদী শ্রমশোষণই মানুষের বিচ্ছিন্নতার মূল কারণ। সেই সঙ্গে মানুষের আদি বিচ্ছিন্নতা যে তাকে সমাজকাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন করে তোলে, অস্তিত্ববাদের সেই বিষয়টিও তিনি মার্কসের বিচ্ছিন্নতা-তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত করে দেন। পরবর্তীকালে ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯), ইয়ুঙ (১৮৭৫-১৯৬১), এডলার (১৮৭০-১৯৪৭), ফ্রম (১৯০০-১৯৮০) এবং ল্যাঙ (১৯২৭-১৯৮৯) প্রমুখ মনস্তত্ত্ববিদ বিচ্ছিন্নতাবাদী তত্ত্ব নিয়ে কাজ করেছেন। এঁদের মধ্যে এরিক ফ্রম তাঁর সিদ্ধান্তে মার্কস এবং ফ্রয়েডের তত্ত্বের মিথস্ক্রিয়ায় দেখাতে চেষ্টা করেছেন, সমাজেকাঠামো নয়, ব্যক্তিমনের গভীরেই নিহিত থাকে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতাবোধজাত নৈঃসঙ্গ্যের কারণ। এভাবেই কালে কালে বিচ্ছিন্নতার দার্শনিক রাজনৈতিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। *রৌদ্র করোটিতে* কাব্যের কালপট গভীর সংকটাপন্ন দেশকালের ভেতর দিয়ে অতিবাহিত। সাতচল্লিশ-উত্তর ঢাকার আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক প্রতিবেশ ও সময় শামসুর রাহমানকে জনবিচ্ছিন্ন এক দ্রষ্টা সত্তার জনক করে তোলে। সমালোচকের ভাষায়:

> সাতচল্লিশের সদ্য স্বাধীন দেশে আধা-ঔপনিবেশিক পরিবেশ ক্রমশ জটিলতর হয়ে উঠতে থাকে। সাতচল্লিশের সদ্য-স্বাধীন দেশে আধা-ঔপনিবেশিক পরিবেশ অচিরেই অর্জনের আনন্দকে করে তোলে নিষ্প্রাণ। ... বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন ও রক্তক্ষয় কোনো সমাধান দেয় না। তারপরেও দুই দশক জুড়ে সামরিক শাসন ও ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে বহু আত্মত্যাগের বিনিময়ে প্রসূত স্বাধীনতাও অল্পকাল পরেই পরিণত হয় শবে। রাজনৈতিক অস্থিরতার সাথে সাথে যুগপৎ সক্রিয় থাকে সামাজিক অস্থিতি। অবশিষ্ট সামন্ত বিকারের সাথে প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক উন্নয়নের সূত্রে নব্য ধনতান্ত্রিক সমাজের উদ্ভবে ঢাকার চরিত্র হয়ে ওঠে আধা-সামন্তিক, আধা বুর্জোয়া। ঢাকা হয়ে ওঠে স্থূল, অসৎ, অনান্তরিক। বিত্ত সকল কিছুর নিয়ন্ত্রক হয়। নগর-মানসে যুক্ত হয় যান্ত্রিকতা, প্রতিযোগিতা-চাতুর্য-দুর্নীতি-বেকারত্ব, হতাশা; বাড়ে বৈষম্য, বিচ্ছিন্নতা, নির্বিকারত্ব। (তারানা ২০০৬: ১১৫)

এ রকম অন্তর্ঘাতময় সময় ও অসম্পূর্ণ নগরজীবন-কেন্দ্রিক জটিলতা সংবেদনশীল ব্যক্তির ওপর গাঢ় প্রভাব ফেলে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের কবিরা যে দ্বিধাদীর্ণ সময়কে যাপন করেছেন, স্বাভাবিকভাবেই সেটি প্রচলিত সমাজ-শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁদের ক্ষুব্ধ করে তোলে। সমসাময়িক ঘটনাবলি তাঁদের চেতনায় এক অনপনেয় 'বহিঃস্রোতক্ষুব্ধ' উপলব্ধির জন্ম দেয়:

> চল্লিশ দশকের শেষাংশ, ও সমগ্র পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর দশক ভ'রে এমন এক দারুণ সময়ের ভেতর দিয়ে সামনের দিকে এগোয় বাঙলাদেশ যে এ-সময় আপন অন্তর্লোকের একান্ত অধিবাসী হওয়া সম্ভব ছিলো না কারো পক্ষে। প্রত্যেককেই প্রথমে হ'তে হয়েছে রাষ্ট্র ও জীবনের বাসিন্দা, পরে অন্য সব কিছু—কবি অথবা ধ্যানী; এবং উত্তেজনা-কলরোল-বাস্তব পীড়নপূর্ণ বাহ্যজীবন-জগত পেরিয়ে এক সময় আপন অন্তর্লোকে পৌঁছে বাঙলাদেশের কবিরা দেখেছেন: আন্তর জগতজীবনকেও দখল ক'রে আছে বাহ্যজগত আর জীবন। একান্ত ব্যক্তিতা ও ব্যক্তিগত স্বপ্নকল্পনা বিদায় নেয় নি তাঁদের বুক থেকে, কিন্তু গুটিয়ে নিয়েছিলো নিজেদের— ... এমন প্রতিবেশে ও মানস-অবস্থায় কবিতাও বাহ্যজীবনময় হ'য়ে উঠতে বাধ্য; এবং হয়েছে তা-ই: সাতচল্লিশ, বিশেষ করে বায়ান্নোর পরে বাঙলাদেশের কবিতায় প্রধান জায়গা ক'রে নেয় জীবন—তার ক্ষুধা, হাহাকার, ক্রোধ, উত্তেজনা; এবং কবিতা হ'য়ে ওঠে বহিঃস্রোতক্ষুব্ধ। (হুমায়ুন ১৯৮৩: ২০-২১)

'বহিঃস্রোতক্ষুব্ধ' এই কাল পঞ্চাশ-ষাটের কবিদের ভেতর রাষ্ট্র, সমাজ ও সমকাল সম্পর্কে নানা ভাবব্যঞ্জনার প্রকাশ ঘটায়। সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে উন্মত্ত ষাটের দশকে ক্রমশ দানা বেঁধে ওঠে স্বাধীকার আন্দোলনের আকাঙ্ক্ষা। অন্ধকার এই সময়পট চিত্রায়ণে এ কালের কবিতায় অশুভবোধের কবি বোদলেয়ার প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেন। সমালোচক মন্তব্য করেন:

> জীবনের উদযাপন *রৌদ্র করোটিতে* কাব্যে মুখ্য, তবে কিছু কবিতায় সেই উদযাপনের প্রস্থানবিন্দুও চিহ্নিত, এবং সে-প্রস্থানবিন্দু বোদলেয়ার। ঐ ফরাসি কবি বাংলা কবিতায় প্রবেশ করেছিলেন তিরিশের দশকেই, কিছুটা এলিয়টের দৌত্যে কিছুটা ইংরেজি অনুবাদে। ... বোদলেয়ারীয় জগতের কালো মদিরা পান করলেন কবিরা: মদ ও মৃত্যুর সমীকৃত জগতে, আত্মভুক দুঃখ-রোগ মত্ততা, পতন-পচন-সংহার, শৌণ্ডিক ও চন্দ্রিমাবিলাসীদের জগতে প্রবেশ করলেন তাঁরা। নানাভাবে বোদলেয়ার ছায়া ফেলেছেন শামসুর রাহমানের চেতনায়, ... শামসুর রাহমান ... ক্রমাগত নগরচারী হয়ে উঠছেন বোদলেয়ারের হাত ধরে। এই পর্বে, যখন তাঁর আত্মতার নির্মোক ভেঙে, নির্জন দুর্গ প্রাকার পেরিয়ে, দ্রষ্টা হয়ে উঠছেন তিনি নাগরিক উৎকণ্ঠায়, বোদলেয়ার তাঁকে শেখালেন—নগর যন্ত্রণাময় ও দান্তের নরক। (খোন্দকার আশরাফ ২০১০: ১০০)

৪

রৌদ্র করোটিতে কাব্যের কবি যেন 'নগরজীবনের এক চলমান ভাষ্যকার' (খোন্দকার আশরাফ ২০১০: ১০০)। বোদলেয়ার তাঁর 'The Painter of Modern Life, and Other Esseys' বক্তৃতায় এই চলমান ভাষ্যকারকেই 'ফ্লনিয়র' অভিধায় অভিহিত করেছেন:

> For the perfect flaneur, for the passionate spectator, it is an immense joy to set up house in the heart of the multitude, amid the ebb and flow of movement, in

> the midst of the fugitive and infinite. To be away from home and yet to feel oneself everywhere at home; to see the world, to be at the center of the world, and yet to remain hidden from the world—such area a few of the slightest pleasures of those independent, passionate, impartial natures which the tongue can but clumsily define. The spectator is a prince who everywhere rejoices in his incognito ... he marvels at the eternal beauty and the amazing harmony of life in the capital cities, ... he gazes upon the landscape of the great cities—he delights in universal life. (Baudelaire 1965: 9-11)

বোদলেয়ারের মতো ফ্লনিয়র অভিধা নিয়ে কাজ করেছেন অ্যানাইস বাজিন (১৭৯৭), বালজাক (১৭৯৯), স্যাঁৎ বভ (১৮০৪), ভিক্টর ফুরনেল (১৮২৯) এবং ওয়াল্টার বেনজামিন (১৮৯২)। সমকাল, নগর ও সংক্ষুব্ধ সময়পট এ সত্তার নির্মাতা। নানা কালে সৃষ্টিশীলদের সাহিত্যকৃতিতে ফ্লনিয়র ভাবকল্প পরিস্ফুট হয়েছে। মলয় রায় চৌধুরী তাঁর এক প্রবন্ধে মন্তব্য করেন:

> উনিশ শতকের প্যারিস মহানগরের পথে পথে টহলক্রিয়াকে চিহ্নিত করে শার্ল বদল্যার একটি ভাবকল্প তৈরি করে দিয়ে গেছেন। ক্রিয়াটিকে তিনি বলেছেন 'ফ্ল্যানেরি' এবং ওই পথচর দর্শককে বলেছেন 'ফ্লনিয়র'। ... আধুনিকতা দেশে-দেশে গড়ে তুলছিল মহানগর, এবং সেই মহানগরগুলোয়, আধুনিকতার অবদানরূপে দেখা দিচ্ছিল আলোকময়তার পরিসর ও অন্ধকারাচ্ছন্নতার পরিসর; বৈভবশালীর এলাকা ও ভিখারি জুয়াড়ি নেশাখোর যৌনকর্মী অপরাধী ও শ্রমিকদের এলাকা। গ্রিক পুরাণে আছে যে ক্রিট দ্বীপে ছিল এক সর্পিল জটিল বিভ্রান্তিকর ভুলভুলাইয়া, আর সেই ভুলভুলাইয়ায় থাকত মাইন্যটর নামের বৃষাসুর, ... জার্মান ভাবুক ওয়াল্টার বেনিয়ামিন ভুলভুলাইয়ার এই গ্রিক রূপকটির তুলনা করেছেন নতুন গড়ে ওঠা উনিশ শতকের ইউরোপীয় মহানগরের সঙ্গে। ... ১৮৬৩ সালে, যে-সময়ে প্যারিস শহরকে পুঁজিবাদের চিত্তাকর্ষক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলছেন তৃতীয় নেপোলিয়ন ও ব্যারন হাউসমান, সে-সময়ে, চারিদিকের ঝিকমিকে ঝিলমিলে দোকান-পসার ও তা উপভোগের জন্য উপচে-পড়া জনসমুদয়কে বিশ্লেষণ করে, নিজেকেও সেই আয়নায় প্রতিফলিত দেখে, 'লে ফিগারো' পত্রিকায় শার্ল বদল্যার একটি প্রবন্ধ লেখেন, যার শিরোনাম ছিলো 'আধুনিক জীবনের চিত্রকর'। রচনাটিতে তিনি ফ্লনিয়র (Flaneur) শব্দটি প্রয়োগ করেন। ... যে লোকটি পথে-পথে গন্তব্যহীন অলস পায়ে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে বেড়িয়ে বেড়ায়, তাকে তিনি বলেছেন ফ্লনিয়র। লোকটাকে ভবঘুরে (Flaneur) বলা যাবে না। সে কোনো-কিছুর ক্রেতা নয়, কেননা সে শপিং করতে বেরোয়নি। ... বস্তুত ফ্লনিয়র লোকটি নিজে একজন অজ্ঞাত সত্তা। ... পুঁজিবাদী সমাজের দুটি প্রধান অনুজ্ঞাকে সে অবহেলা ও অস্বীকার করছে: প্রথমত তার তাড়া নেই এবং দ্বিতীয়ত তার কিছু কেনার নেই ... (মলয় ২০১৯)

বোদলেয়ারের মতে, অনির্দিষ্ট পথই যার মূল গন্তব্য সে রকম একজন ব্যক্তিই ফ্লনিয়র। সমাজে ফ্লনিয়রের কোনো তাড়না নেই, নির্লিপ্তভাবে সে পুঁজিবাদী সভ্যতাকেন্দ্রিক পণ্যপসরার চাকচিক্যকে পাশ কাটিয়ে যায়। সুপুষ্ট, মাংসল ভিড়ের একজন হয়ে হেঁটে যাওয়া নির্লিপ্ত এক মনোভঙ্গির জনক এবং মহানাগরিক হয়ে ওঠাতেই এই ব্যক্তিসত্তার সার্থকতা, যার ভেতর কালের ক্ষত সুস্পষ্টভাবে মুদ্রিত। জনসমুদ্রে, পণ্যবাজারের শোভায়, ভিড়ে, দোকানপাটের কেনাবেচায় সে এক 'ভিড়ের মানুষ', যদিও শুধু 'ভিড়ের মধ্যকার মানুষ' নয়। অর্থাৎ ভিড়ের ভেতরেও যে সত্তা নিজেকে তার চেতনাগত বোধের সাহায্যে একাকিত্বের ঘেরাটোপে বন্দি

রাখতে জানেন, তিনিই মূলত ফ্লনিয়র। একজন ফ্লনিয়র পুঁজিবাদী ব্যস্ত শহরের চলমান ছবিগুলোকে চেতনায় ধারণ করেন। তার এ যাত্রা উদ্দেশ্যহীন, কর্মহীন এবং গন্তব্যহীন। কোথাও যাবার তাড়া নেই, ভিড়ে সে ভারাক্রান্ত নয়; বরং স্বাধীন ও নামহীন সত্তা কবিতার প্রধান নিয়ামকশক্তি হিসেবে গ্রহণ করেন এই ভিড়াক্রান্ত জনগণ ও তার পরিপার্শ্বকে।

বোদলেয়ারের 'ভিড়' কবিতা বিশ্লেষণে করলে অনুভূত হবে পুঁজিবাদী সভ্যতা থেকে উদ্ভূত ফ্লনিয়র সত্তার তাগিদহীন জীবনের আকাঙ্ক্ষা। 'পাশ দিয়ে যাওয়া পথচারিণী', *প্যারিস-চিত্রের* 'সূর্য', 'সান্ধ্য প্রদেশ', 'প্যারিস-স্বপ্ন' ইত্যাদি কবিতায় ফ্লনিয়র সত্তার রূপচিত্র এঁকেছেন বোদলেয়ার। তাঁর 'অন্ধেরা' কবিতায় মহানগরীর প্রমোদজীবনকে তিনি দ্রষ্টা সত্তায় ধারণ করেছেন: 'হে মহানগরী! তুমি যবে নেচে, কুদে, চারদিকে তুলে উচ্চতান/ হ'য়ে ওঠো প্রমোদের যন্ত্রণার প্রেমিক প্রহরী—/ আমিও প্রগাঢ়তর মূঢ়তায় পথে-পথে ঘুরি, আর ভাবি: ঐ যে অন্ধেরা, ওরা নভতলে কী করে সন্ধান?' ('অন্ধেরা')। 'সূর্য' কবিতায় তিনি লিখছেন:

> পুরোনো শহরগুলি, জীর্ণ ঘরে যেখানে খড়খড়ি
> গুপ্ত কোনো ব্যসনের কুঞ্জবনে সতর্ক প্রহরী,
> যখন নিষ্ঠুর সূর্য তীক্ষ্ণ তীর দ্বিগুণিত করে
> নগর, প্রান্তর, শস্য, সারি সারি ছাতের উপরে,
> আমি একা, অদ্ভুত ব্যায়ামে মগ্ন, পথে হেঁটে হেঁটে
> কখনো চমকে উঠি ফুটপাতে কথার হোঁচটে,
> কোণে-কোণে মিলের দৈবাৎ পাওয়া গন্ধের সংকেতে
> হুমড়ি খেয়ে পড়ি কোনো বহুদিন-ঈপ্সিত পঙ্‌ক্তিতে। ('সূর্য', বোদলেয়ার ২০১৬: ১০১)

সূর্যের মহৎচুম্বনে উজ্জ্বলিত নগরের পথে পথে পরিভ্রমণরত বোদলেয়ারের ফ্লনিয়র। শামসুর রাহমানের 'সূর্যাবর্ত' কবিতাটিও এই অনুষঙ্গে মনে পড়বে:

> এখনও সূর্যের আলো পৃথিবীতে আসে
> যথারীতি, ঝরনার মতন ঝরে সম্পন্ন গৃহীর
> নিকোনো উঠোনে আর কবরের পুরানো ফাটলে।
> পিচ্ছিল শবের ভোজে মত্ত কৃমি অথবা আজানে
> উচ্চকিত সবচেয়ে উঁচু কোনো উজ্জ্বল মিনার
> সবাই অলক্ষ্যে পায় সূর্যের প্রসাদ
> সমপরিমাণে; ('সূর্যাবর্ত', শামসুর ২০১৭: ২৩০)

রাহমান তাঁর *রৌদ্র করোটিতে* কাব্যে বোদলেয়ার-রচিত নির্মোহ সত্তাধারী ফ্লনিয়রের আদলটি কেন এবং কীভাবে গ্রহণ করেছেন, সে বিষয়টি নিয়ে আলোকপাত করা প্রয়োজন। রাহমানের কাব্যে হতক্লান্ত জনতার ভেতর দিয়ে হেঁটে যাওয়া কবি যেন পুঁজিবাদী সমাজ-সভ্যতাকে অবজ্ঞা করা তাড়না-তাগিদহীন এক ফ্লনিয়র। 'ইউরোপের শহরকেন্দ্রিক সভ্যতার নিপীড়ন বোদলেয়ারসহ বহু কবিকে যেমন উদ্বাস্তু করেছে, তাঁরা শহরের সঙ্গে নাড়ির যোগাযোগটি হারিয়ে শুধুই রাস্তায় ও পার্কে, জনস্রোতে ঘুরেছেন, স্বস্তি পাননি, নিরাময় লাভ করেন নি ঐ অসুখ থেকে' (সৈয়দ মনজুরুল ১৯৯১: ৪২-৪৩)। শামসুর রাহমানের কবিসত্তাও তেমনি

স্বস্তিহীন এক অসুখ নিয়ে জনবিচ্ছিন্ন অবস্থায় জনস্রোতের একজন হয়ে উঠতে ব্যর্থ হয়েছেন। রাহমানের *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* কাব্যগ্রন্থে তিনি ঠিক ফ্লনিয়র নন, আউটসাইডার। ল্যাজারাস হিসেবে ওই কাব্য থেকে *রৌদ্র করোটিতে* তাঁর যাত্রা মৃত্যুলোক থেকে জীবনের গন্ধভরা ঝাঁঝালো পৃথিবীতে। কবি লিখেছেন:

> মনে হয় আমি যেন সেই লোকশ্রুত ল্যাজারাস,
> তিনদিন ছিলাম কবরে, মৃত—পুনর্জীবনের
> মায়াস্পর্শে আবার এসেছি ফিরে পৃথিবীর রোদে।
> পোশাকের জেল্লা তবু পারে না লুকাতে কোনোমতে।
>
> বিকৃত দেহের ক্ষত, লোবানের ঘ্রাণ সহজেই
> ডুবে যায় প্রাক্তন শবের গন্ধে; নীল আঙুলের
> প্রান্তে বিদ্ধ তিনটি দিনের ক্ষমাহীন অন্ধকার
> ভাস্করের অসম্পূর্ণ মূর্তির মতন ঘুরে ফিরি।
>
> উল্লোল নগরে কত বিলোল উৎসবে; কিন্তু তবু
> পারি না মেলাতে আপনাকে প্রমোদের মোহময়
> বিচিত্র বিকট স্বর্গে। বিষাক্ত ফুলের মতো কত।
> তন্ময় রহস্য জ্বলে ওঠে আজও দু'চোখে আমার। ('প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে', শামসুর ২০১৭: ২২)

একজন আউটসাইডার বলেই তিনি উল্লোল শহরের বিলোল উৎসবে নিজেকে মেলাতে পারছেন না। কাব্যের শুরুতেই যন্ত্রণাময়-মৃত্যুদীর্ণ কাব্যবোধে আক্রান্ত হবার এই বিষয়টি কলিন উইলসন রচিত *দি আউটসাইডার* রচনার প্রভাব। মৃত্যুময়তা থেকে জেগে ওঠা অভিযোজন-অক্ষম কবির কাছে আমৃত্যু লালিত ঢাকাকে নরকসদৃশ মনে হয়। তবে, *রৌদ্র করোটিতে* কাব্যে নরকসদৃশ নগরে তিনি আউটসাইডার সত্তা ত্যাগ করে জেগে ওঠেন এক দ্রষ্টা সত্তা নিয়ে:

> ক. জীবনকে খণ্ড খণ্ড চিত্রে দেখেছি—কখনো সুন্দর
> কখনো কুৎসিত। যুবককে দেখেছি
> দুপুর সন্ধ্যা আর রাত্রিকে রেণুর মতো
> উড়িয়ে দিতে হাওয়ায় আর বৃদ্ধকে দেখেছি তার
> খাটো মোমবাতিটাকে হিংসুক বাতাসের
> বিরোধিতা থেকে রক্ষা করার জন্য কী ব্যস্তবাগীশ। ('ইতিহাস, তোমাকে', শামসুর ২০১৭: ২৫৩-২৫৪)
>
> খ. বড় রাস্তা, ঘুপচি গলি, ঘিঞ্জি বস্তি, ভদ্রপাড়া আর
> ফলের বাজার ঘুরে খেলনার দোকানের সামনে
> দাঁড়ালাম। কাচের আড়ালে দেখি কাঠের পুতুল,
> রেলগাড়ি, ছক-কাটা বাড়ি ...
> ... ...
> ইচ্ছে হয় মুখ ঘষি খেলনার দোকানের কাচে

বড় ইচ্ছে হয় ঘষি দু'টি চোখ। যে-বিড়িটা কানে
গুঁজে ভোরে বেরিয়ে পড়েছি পথে তাই টানি সুখে
এখানে দাঁড়িয়ে ঠায় দুপুরের ঠা ঠা রোদে। যদি
ছুঁয়ে দেখি স্বচ্ছ কাচ সূর্যসেঁকা আত্মায় আরাম
'দূর হ এখান থেকে হা-ভাতে ভিখিরি কোথাকার
আস্তাকুঁড়ে বেছে নে আস্তানা, নোংরা খুঁটে খা-গে'—
দোকানি খেঁকিয় ওঠে। খেলনা ফেলনা নয় জানি,
এখন এখান থেকে, আল্লা যাব কোন জাহান্নামে!
খেলনা ফেলনা নয়। ফলের বাজার, পুতুলের
স্থির চোখ ... পীরের মাজার, হৈচৈ মানুষের ভিড়,
গাঁয়ের নদীর তীর গুঞ্জরিত বাউলের স্বরে ...
... ... বাজনা বাজে, ফলের বাজার
ফ্রকপরা ফুটফুটে মেয়েটির একটি দু'আনি
হাতের চেটোয় নাচে, কাচের আড়ালে দুই যোদ্ধা,
সেপাই রাঙায় চোখ, ভদ্দরপাড়ায় বাজনা বাজে,
আস্তাকুঁড়ে বেছে নে আস্তানা', খেলনা ফেলনা নয় ... ('খেলনার দোকানের সামনে ভিখিরি', শামসুর ২০১৭: ২৫৭-২৫৯)

গ. থাকি শহরে, আমার শহরে।
উর্ধ্বশ্বাস ট্রাফিকের ব্যস্ততায় বিজ্ঞাপনের মতো
ঝলমলিয়ে ওঠা হাসি
শিরায় আনে আশ্চর্য শিহরণ:
মনে হয় যেন ঢক করে গিলে ফেলেছি
এক ঢোক ঝাঁঝালো মদ। ('যদি ইচ্ছে হয়', শামসুর ২০১৭: ২৪০)

উপর্যুক্ত কবিতাগুলোতে রাহমান নির্মীয়মাণ ঢাকার উঠতি পুঁজিপতি শ্রেণি আর ছিন্নমূল মানুষের ভেতর বিস্তর ব্যবধান অনুভব করেন তাঁর অনুসন্ধিৎসু সত্তা দিয়ে। যিনি ঢাকাকে ক্রমান্বয়ে বিজ্ঞাপনসর্বস্ব ঝাঁ চকচকে-ঝলমলে নগর হিসেবে গড়ে উঠতে দেখেন, দেখেন এই নগরের ঘিঞ্জি গলি, বড় রাস্তা, ঘিঞ্জি বস্তি এবং তার মানুষজনকে। অনুভব করেন ছিন্নমূল মানুষের বেদনা, ক্ষোভ আর অবদমিত স্বপ্নকে। বোদলেয়ারের মতোই উপলব্ধি করেন শ্রেণিগত ব্যবধান থাকলেও সূর্যের প্রসাদ পায় ধনিকশ্রেণি, উদ্বাস্তু মানুষ, ছিন্নমূল মানুষ, জীবিত বা মৃত সমপরিমাণে।

৫

রৌদ্র করোটিতে কাব্যের ফ্লনিয়র এক গম্ভীর, বিষণ্ন সত্তা। বিষণ্নতার রূপাবয়ব নির্মাণেও শামসুর রাহমান আত্মস্থ করেছেন বোদলেয়ারকে। 'বোদলেয়ারের কাব্যে ... কোনো নির্বিষাদ সত্তা, শুধু যে সুন্দর হ'তে পারে না তা নয়, পূর্ণ মনুষ্যত্বপ্রাপ্ত হয় না' (বুদ্ধদেব ২০১৫: ১৭)। আর্তি, মনস্তাপ, বেদনার প্রকাশ ছিল প্রাচীন সাহিত্যে। কিন্তু বিষাদের আবিষ্কার রেনেসাঁসের

যুগে। বিষণ্ন হওয়া মানুষের স্বভাবের একটি চারিত্র্যলক্ষণ, সেটি রেনেসাঁসই মানবচেতনায় যুক্ত করে দিল যেন। একেই বলা হয় বিষাদ বা 'Ennui'। এ সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন:

> বিষাদ, যা য়োরোপীয় রেনেসাঁসের একটি আবিষ্কার, যার প্রথম উদাহরণ পেত্রার্কার কবিতায়, তাকে মানুষের এক জন্মান্তরক্ষণে, দা ভিঞ্চি হাসির মধ্যে দ্রব ক'রে দিলেন; কোনারকের বাদিনী মূর্তির হাস্য যেমন আনন্দময়, তেমনি মোনালিসার হাসি বিষাদে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট। এমনকি বতিচেল্লির ভেনাসের মুখেও আমরা নির্ভুলভাবে বিষাদের আভাস দেখতে পাই ... রেমব্রান্টের সারি-সারি প্রতিকৃতি, সারি-সারি বিষণ্ন চোখ খুলে রেখে, আমাদের ভুলতে দেয় না মানুষ কত রহস্যময়। ... বোদলেয়ার রোমান্টিকশ্রেষ্ঠ, যিনি জানেন যে তাঁর যন্ত্রণার কারণ তিনি নিজেই ... দুঃখকে তিনি একটি প্রয়োজন ব'লে অনুভব করেন। ... তাঁর বিষাদ পরিণত হয়েছে বিতৃষ্ণায়—শুধু জগতের প্রতি নয়, নিজেরও প্রতি; এবং বিতৃষ্ণা থেকে সঞ্জাত হয়েছে নির্বেদ। ... এই নির্বেদেরও উৎসস্থল চেতনার অবলুপ্তি নয়, চেতনার আতিশয্য। (বুদ্ধদেব ২০১৫: ১৮-১৯)

বোদলেয়ার মানুষকে দেখেছেন 'an oasis of horror in a desert of' রূপে। রাহমানের *রৌদ্র করোটিতে* আছে এই মানস-যন্ত্রণা বা এনুই। বিষাদ থেকে বিতৃষ্ণা এবং বিতৃষ্ণা থেকে নির্বেদ। বোদলেয়ারের চেতনার প্রাখর্য তাঁকে দিয়েছে এই বোধ। চেতনার প্রাখর্য রাহমানের ভেতরের বিষাদকে বিতৃষ্ণায় পরিণত করেছে, যে বিতৃষ্ণা শেষ পর্যন্ত বোদলেয়ারের মতোই তাঁর ভেতর নির্বেদের জন্ম দিয়েছে। *রৌদ্র করোটিতে* কাব্যের বেশ কিছু কবিতায় কবির এই চেতনাগত প্রাখর্য উপলব্ধি করা যাবে:

ক. ধুলো গিলে ভিড় ছেনে উকুনের উৎপাত উজিয়ে
ক্লান্তি ঠেলে রাত্তিরে ঘুমোতে যাই মাথাব্যথা নিয়ে।
না জ্বেলে ক্ষয়িষ্ণু মোমবাতি স্বপ্নচারী বিছানায়
গড়াই, লড়াই করি ভাবনার শত্রুদের সাথে—
হাত নাড়ি লাথি ছুঁড়ি পৃথিবীর গোলগাল মুখ
লক্ষ্য করে। বিবেকের পিঁপড়ে যদি সত্যি হেঁটে যায়
পিচ্ছিল দেয়ালে, মন থেকে মুছে নেব ছোটখাটো
পাপবোধ অল্পবিস্তরেণ ... পোষমানা মূল্যায়নে
পাব সুখ দেখব কি নেড়েচেড়ে এক টুকরো হলদে
নিষ্প্রাণ কাগজে মোড়া আত্মা,
... ...
তাকাব না কখনো বাইরে ...
ঘরে জানলা নেই। ... হলুদ যেসাস বিদ্ধ কড়িকাঠে
রৌদ্রঝলসিত কাক ওড়ে মত্ত রক্তে কাঠফাটা
আত্মার প্রান্তরে। সারারাত
অনিদ্রা দুঃস্বপ্ন আর
ছারপোকা, ছিদ্রান্বেষী ইঁদুরের উৎপাত উজিয়ে
ময়লা চাদর ছেড়ে উঠি ফের মাথাব্যথা নিয়ে। ('খুপরির গান', শামসুর ২০১৭: ২১৫-২১৬)

খ. শয্যাত্যাগ, প্রাতরাশ, বাস, ছ'ঘণ্টার কাজ, আড্ডা,
খাদ্য, প্রেম, ঘুম, জাগরণ; সোমবার এবং মঙ্গলবার
বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি আর রবিবার একই
বৃত্তে আবর্তিত আর আকাশ তো মস্ত একটা গর্ত—
সেখানে ঢুকব নেংটি ইঁদুরের মতো। থরথর
হৃদয়ে প্রতীক্ষা করি, স্বপ্ন দেখি আগামীকালের
সারাক্ষণ, অনেক আগামীকল্য উজিয়ে দেখেছি
তবু থাকে আরেক আগামীকাল। সহসা আয়নায়
নিজের ছায়াকে দেখি একদিন—উত্তীর্ণ তিরিশ।

পূর্ণিমা চাঁদের দিকে পিঠ দিয়ে, অস্তিত্বকে মুড়ে
খবরের কাগজে ছড়াই দৃষ্টি যত্রতত্র ... ('আত্মহত্যার আগে', শামসুর ২০১৭: ২৩৪)

গ. নেশার খোঁয়ারি কেটে গেলে পৃথিবীকে
নির্বোধের হাসির মতোই মনে হয়।
শূন্য প্রহরের দীর্ঘশ্বাস বৃথা প্যানিক ছড়ায়
এবং নড়ায় স্তব্ধ আদর্শের ভিত।
... ...
জানি এই ভিড় ঠেলে, ঢিলে ঢালা সস্তা স্যুট প'রে
রাস্তার দাম্ভিক শত বিজ্ঞাপন প'ড়ে, পুঁইশাক
ডাঁটার চচ্চড়ি,
নিরীহ মাছের ঝোলে ডুবিয়ে জীবন
থাকব, বাঁচব আমি দিনের চিৎকারে
রাত্রির করুণ স্তব্ধতায়। ('অস্তিত্বের তন্ময় দেয়াল', শামসুর ২০১৭: ২৪১)

ঘ. ক্লান্ত হয়ে স্বপ্ন দেখি: পেরিয়ে হলুদ মরুভূমি
একটি বিকট সিংহ আত্মাটাকে নেড়ে-চেড়ে শেষে
ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জীর্ণ জঞ্জালে নিঃশব্দে চলে গেছে।
হয়তো রোচেনি মুখে, কিংবা যেটা যোগ্য কুকুরের
কী করে বসাবে ভাগ তাতে অরণ্যের অধীশ্বর
নিজের ছায়াকে দেখি হেঁটে যায় দূরে, আমি তার
অনুগামী। কয়েকটি প্রবঞ্চক স্বর গান হয়ে
মিশে যায় কঙ্কালের মতন বৃক্ষের অন্তরালে ('স্বগত ভাষণ', শামসুর ২০১৭: ২৫৬-২৫৭)

প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে কাব্য থেকে *রৌদ্র করোটিতে* কাব্য পর্যন্ত শামসুর রাহমানের বিষাদ বা এনুই পরিণত হয়েছে প্রাত্যহিকতার একঘেয়েমিপূর্ণ বিতৃষ্ণায়। প্রথম কাব্যে চারপাশের বিনষ্ট সমাজকে তিনি কল্পনা করেছেন কবরের উপমায়। ওখানে তিন দিন মৃতের মতো কাটিয়ে পুনর্জীবনের মায়াস্পর্শে আবার পৃথিবীর রোদে প্রত্যাবর্তন করেছেন, কিন্তু বলেছেন, 'সত্তায় এনেছি বয়ে অন্তহীন আশ্চর্য বিষাদ'। ... বিষাদের ভাব দ্বিতীয় কাব্যে নতুন

তাৎপর্য লাভ করেছে। যে প্রতিকূল পরিবেশের ফল বিষণ্নতা, প্রথম কাব্যে সেটা স্পষ্টতা লাভ করেনি, বরং অনেকটা মননপ্রধান বলে ধারণা জন্মে। *রৌদ্র করোটিতে* কাব্যে পরিবেশ স্পষ্ট হয়ে ঢাকাকেন্দ্রিক হয়েছে, কবির ভাবনাও মীমাংসিত হয়ে এসেছে। নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের তুচ্ছতা একঘেয়েমি এই কাব্যের পটভূমিরূপে ব্যবহৃত। দৈনন্দিন জীবনও শয্যাত্যাগ, প্রাতরাশ, আড্ডা, ছ-ঘণ্টা কাজ এ সবের মধ্য দিয়ে গতানুগতিক ও ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে কবির কাছে। এমন জীবনে দুঃখ অনিবার্য—তিনি তাঁর চারপাশে দুঃখের সর্বব্যাপী উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করেন। (সাঈদ ২০০১: ২৩৫-২৩৬)

গ চিহ্নিত কবিতায় বোদলেয়ারের 'বিতৃষ্ণা' শীর্ষক চারটি কবিতার একটির সঙ্গে গভীর সাযুজ্য উপলব্ধ হবে। 'বিতৃষ্ণা' কবিতার চারটিতেই বোদলেয়ার জীবনের প্রতি দুর্মর বিবমিষার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। নিজের ভেতর ক্রমান্বয়ে জমে ওঠা পুঞ্জীভূত জঞ্জালের ভারে যেন তিনি ন্যুব্জ। যেন তিনি এক প্রকাণ্ড ভারাক্রান্ত দেরাজ, যার খোপে খোপে এবং মগজের বিষণ্ন কোটরে জমেছে মনস্তাপ, নির্বেদ আর জীর্ণতা। যেন এক গহ্বরযুক্ত পিরামিড, ভাঙা গোরস্তান আর অন্ধকার কবরখানা তিনি। জীবনের ভার তাঁর ভেতর জন্ম দেয় বিতৃষ্ণায় মোড়ানো এক বিস্রস্ত অন্তঃপুরের:

> বিবর্ণ গোলাপে ভরা আমি এক জীর্ণ অন্তঃপুর,
> সেকেলে কাঁচুলি, জামা ঝুলে আছে বিস্রস্ত, প্রচুর,
> আর শুধু করুণ পাস্টেল-চিত্র, দুটি ম্লান বুশে
> অন্তঃসারশূন্য এক করঙ্কের গন্ধ নেয় শুষে।
> এই খঞ্জ দিবসেরে দীর্ঘতায় কে পারে ছাড়াতে—
> যখন, তুষারময় বৎসরের হিমার্ত কারাতে
> ব্যাপ্ত হয় নির্বেদ—চেতনারিক্ত জড়ের সন্তান—
> ব্যাপ্ত হয় অমরত্বে, অন্তহীন যার পরিমাণ ... ('বিতৃষ্ণা', বোদলেয়ার ২০১৫: ৯১)

এই কবিতার সঙ্গে শামসুর রাহমানের 'মাথায় ভাবনা নিয়ে' কবিতার গভীর সাযুজ্য লক্ষযোগ্য:

> মাথায় ভাবনা নিয়ে খুপরিতে আছি শুয়ে এই
> নিজের আঁধারে লগ্ন, দেখি
> ময়লা দেয়ালে আঁকা দুঃখের নিভৃত ফুল আর
> মনকে প্রবোধ দিই: রাত্রিদিন দুর্দশার ঢাক
> বাজিয়ে কী লাভ?
> ... ...
> দ্যাখো এই আমার ঘরের আসবাব: ইতস্তত
> দারুণ হতাশা লেপ্টে রয় কড়িকাঠে
> কামিজে ইজেরে আর মনস্তাপ ঝোলে
> আলনায় এবং মাংসের ঝোলে নাচে বিভীষিকা! ('মাথায় ভাবনা নিয়ে', শামসুর ২০১৭: ২৩৯)

এভাবেই বোদলেয়ার আর শামসুর রাহমানের অন্তঃচেতনার বিষাদ-বিতৃষ্ণা আর নির্বেদের খেদ তাঁদের বহির্বাস্তব পৃথিবীর গায়ে যুক্ত হয়ে যায়। হা-খোলা কবর, প্রেত, খানা-খন্দ, কৃমি-

কীট-কঙ্কাল, করোটি আর শবের অনুষঙ্গ বোদলেয়ারের কবিতায় বিষাদ-বিতৃষ্ণা আর নির্বেদের প্রতীক। এগুলো মূলত বিপন্ন অস্তিত্ব এবং জীবনাকাঙ্ক্ষার ব্যর্থতাবোধ-জাত অনুষঙ্গ। শামসুর রাহমানের *রৌদ্র করোটিতে* কাব্যের কবিতাগুলোতে এই প্রতীকের অনুরণন ঘটেছে। আইয়ুবীয় শাসনব্যবস্থায় অর্থনৈতিক ব্যবধান, ব্যক্তির দুর্মর নৈঃসঙ্গ্য, মধ্যবিত্তের বৃত্তাবদ্ধ জীবনসংকট, কণ্ঠরোধী প্রতিবাদহীন সত্তার বেদনা, কবন্ধের শাসনে জন্ম নেওয়া কবন্ধ শ্রেণির সুবিধাবাদী বিবর্ণ আত্মার প্রতীক হিসেবে এসব নেতিবাচক অনুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কবিতার অংশ তুলে দেওয়া গেল:

ক. শীতের প্রখর রাত্রি দিয়েছে নামিয়ে
আমাদের অন্ধকার হা-খোলা কবরে।
হয়তো চাঁদের প্রেত খানা-খন্দে উঁকি
দেবে ক্ষণকাল, ক্ষণকাল গোপন রাত্রির কানে
দুল হয়ে থাকবে ঝুলে ক'টি চামচিকে
তৃতীয় প্রহরে। রাত্রিভর হিম হাওয়া বয়ে যায়
রক্তের ফেনিল হ্রদে আর বারবার কেঁপে ওঠে
অস্তিত্বের প্রচ্ছন্ন কংকাল। ('শীতরাত্রির সংলাপ', শামসুর ২০১৭: ২৫২)

খ. তিনটি বালক যেন নরক-পালক, সহযাত্রী
দুঃখের ভ্রমর-ডিসেম্বরে ফুটপাতে
কুঁকড়ে থেকে এক কোণে হাড়ে হাড়ে টের পায় যারা
হিমেল হাওয়ার ধার: শরীরের মাংস যেন খ'সে প'ড়ে যাবে
ইতস্তত পচা কমলালেবুর মতো নামমাত্র স্পর্শে ('তিনটি বালক', শামসুর ২০১৭: ২২৩)

গ. বিশ্বাসের
রাজ্যে শুধু অন্ধের স্বভাবে বিচরণ, সায় দেয়া
কবন্ধের শাস্ত্রের শাসনে, ...
ঈশ্বর কি শিউরে ওঠেন মলভাণ্ডে? উনুনের
কড়াইয়ে তীব্র জ্বালে কুঁকড়ে যান কাগজের মতো? ('আত্মহত্যার আগে', শামসুর ২০১৭: ২৩৪)

ঘ. পাপকে হৃদয়গ্রাহী করে তুলি হ্রদের আলোর
মতো যদি উৎপীড়িত অন্ধকারে, ঘেয়ো ভিখিরির
ছেঁড়া ন্যাকড়ার ভাঁজে নক্ষত্রের ছায়া দেখি যদি
... ...
ডানপিটে সূর্যটাও সহসা উধাও অন্ধকার
বনে; নিশাচর বেদে চাঁদের প্রসন্ন মুখে পাখা
ঝাপটায় ঢাউস বাদুড়, ছিঁড়ে ফেলে শুভ্রতাকে।
কখনো দেখব স্বপ্ন—কয়েকটি জলদস্যু যেন
অবলীলাক্রমে কাটা মুণ্ডুর চামড়া নিছে তুলে
অব্যর্থ ছোরার হিংস্রতায়,

... ...
হঠাৎ দেখব জেগে শুয়ে আছি হাত-পা ছড়ানো
বিকেলের সাথে নামহীন কবরের হলদে ঘাসে,
দেখব অঢেল রৌদ্রে ঝল্‌সে উঠে ঝরায় চুম্বন
ওষ্ঠহীন করোটিতে, জানব না সে করোটি কার,
সম্রাট অথবা ভাঁড় যার হোক আমি শুধু একা
দেখব রৌদ্রের খেলা একটি নির্মোহ করোটির
তমসায় ('রৌদ্র করোটিতে', শামসুর ২০১৭: ২৬৫-২৬৬)

বোদলেয়ারের 'বিতৃষ্ণা' কবিতায় শীতল বৃষ্টির দৌরাত্ম্য যেমন নেমে এসেছে জীবিত আর মৃতের জগতে ('বিরক্ত বর্ষার মাস অবিরল সমস্ত শহরে/ অফুরন্ত পাত্র থেকে ঢালে তার ঠাণ্ডা অন্ধকার, সন্নিকট গোরস্থানে মুছে-আসা মৃতদের 'পরে,/ আর ম্লান শহরতলিতে ঢালে মরত্বের ভার'), তেমনি শামসুর রাহমানের 'শীতরাত্রির সংলাপ' কবিতায় পাঠক অনুভব করবেন কবির অস্তিত্বের প্রচ্ছন্ন কঙ্কাল কম্পমান। শীতরাত্রির প্রবল শীতলতা জীবিত ও মরজগতে একইসঙ্গে হানা দিয়েছে। এই রকম এক শীতল রাতে রহস্যময় নিঃসঙ্গ মানুষের প্রতিচ্ছায়া উজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে। 'তিনটি বালক' কবিতায়ও শীতের প্রাবল্যে হিমহাড় থেকে পচা কমলার মতো খসে পড়া মাংসের তুলনা করেছেন কবি। শেষের এই উপমা, বোদলেয়ারের চাইতে জীবনানন্দ দাশকেই মনে করিয়ে দেয় বেশি: আবার যেন ফিরে আসি/ কোনো এক শীতের রাতে/ একটা হিম কমলালেবুর করুণ মাংস নিয়ে' ('কমলালেবু')। অন্য দিকে, বোদলেয়ারের মনোজগতে কেবলই বিতৃষ্ণার আনাগোনা, যে বৃষ্টিময় শীতার্ত দিন তাঁর হৃদয়ে নির্বেদের ব্যাপ্তি ঘটায়। রাহমানের 'আত্মহত্যার আগে' কবিতার সঙ্গে জীবনানন্দ দাশের 'মৃত্যুর আগে' কবিতার ভাবগত বৈসাদৃশ্য আছে। এই কবিতায় রাহমান কবন্ধরূপ স্বৈরাচারী শাসকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জনতার কাছে বিবর্ণ এবং মলভাণ্ডের মতো অকেজো এক ঈশ্বরকে অনুভব করেন। ঈশ্বরের এই ইমেজ বোদলেয়ারের 'রোমান্টিক সূর্যাস্ত' কবিতার অপসৃত ঈশ্বরকেই যেন স্মরণ করিয়ে দেয়: 'অপসৃত আমার ঈশ্বর।/ রাত্রি, অপ্রতিরোধ্য, স্যাঁতসেঁতে, কবন্ধ, মৎসর,/ ছড়ায় সাম্রাজ্য তার, আর্তিময়, চেতনারহিত' ('রোমান্টিক সূর্যাস্ত')। 'আত্মহত্যার আগে' কবিতাটিতে মলভাণ্ডের সঙ্গে ঈশ্বরের সন্নিপাত ঈশ্বরের সিদ্ধ গুণাবলির হত্যা ঘটায়, আত্মহননের যন্ত্রণা অনুভববেদ্য, সরব হয় এবং সুন্দর ও কুৎসিতের যমজ প্রতিতুলনা স্মরণে আনে' (হায়াৎ ২০০৬: ১১৭)। অন্যত্র, 'রৌদ্র করোটিতে' কবিতায় তিনি উৎপীড়িত অন্ধকারে পাপকে হ্রদের আলোর মতো হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে চেয়েছেন, অন্ধকার ও আলোর বৈপরীত্য সৃজনের মধ্য দিয়ে 'অস্তিত্ব ও সত্তা'র দ্বন্দ্ব নির্মাণে সচেষ্ট হয়েছেন। পঙ্কিলতার ভেতর সৌন্দর্য অনুসন্ধানের এই প্রচেষ্টা বোদলেয়ারের কথাই মনে করিয়ে দেয়। সমালোচকের ভাষায়:

> অন্ধকার ও আলোর দ্বান্দ্বিকতাই কেবল নয়, অস্তিত্ব ও সত্তার বিরোধিতাও সংকেতিত। উৎপীড়িত অন্ধকারে অস্তিত্বের অনস্তিত্বে চিহ্নহীন হওয়ার জন্য মাদকাসক্তিতে বুঁদ হওয়ার ইচ্ছার বিপরীতেই 'হ্রদের আলোয়' হৃদয়ের অবগাহন সত্তারই অন্বেষণ। ... উপমাটি বোদলেয়ারকে স্মরণ করায়—পাপের অতলে তলিয়ে গিয়ে সৌন্দর্যকে সন্ধান, পাপকে হৃদয়গভীরে যাপন করার অভিজ্ঞান আর তা থেকে পূর্ণতা ও সৌন্দর্যকে ছেঁকে আনা,

আলোতে উত্তরণ-অভীপ্সায় অধীর হয়ে ওঠা। কাজেই উচ্চারণ ও ভাষার আকরণে রচিত হল বিরোধাভাসের জড়াজড়ি অবস্থা। (বেগম আকতার ২০১৪: ৫২)

এই কবিতায় ঢাউস বাদুড়ের যে রূপকল্প নির্মাণ করেছেন রাহমান, সেটি অপশক্তির প্রতীক। বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের প্রতীক চন্দ্রমার শুভ্রতাকে যে অপশক্তি ছিঁড়ে ফেলতে চায় তার অশুভসত্তার স্পর্শে। বোদলেয়ারের কবিতায়ও বাদুড় ব্যবহৃত হয়েছে, তবে সেটি কবিতায় হয়ে ওঠে নিঃসঙ্গ মানুষের নড়বড়ে, দুর্বল আশার প্রতীক: 'যখন পৃথিবী ডুবে যায় এক স্যাঁৎসেঁতে পাতালে, যেখানে দুর্বল আশা, বাদুড়ের মতো ঘুরে-ঘুরে/ পলাতে পারে না, ঠোকে ত্রস্ত পাখা দেয়ালে-দেয়ালে,/ অবশেষে পোকা-পড়া পচা ছাতে মরে মাথা খুঁড়ে'। রাহমান মূলত কাটামুণ্ডু, বাদুড়, কবন্ধ ইত্যাদি শব্দের ব্যবহারে সমকালকেই যুক্ত করে দিয়েছেন। 'নরমুণ্ডের নৃত্য' কবিতাও তেমনই একটি যেখানে সমকালীন শাসকের স্বৈরতন্ত্রের চাপে ব্যক্তিমানুষের স্বপ্নহননের ইঙ্গিত মেলে:

নরমুণ্ডের ভয়াল নৃত্যে
চলছে যখন স্বপ্ন হনন,
দুঃস্বপ্নের ঊর্ণাজালেই
দার্শনিকের প্রবীণ কণ্ঠে
মানবতা আনে অযুত যুগের
সূর্যোদয়ের প্রেমঘন ভাষা। ('নরমুণ্ডের নৃত্যে', শামসুর ২০১৭: ২৫০)

এই কবিতার নামশব্দ বোদলেয়ারের 'মরণের নৃত্য' কবিতার কথা মনে করিয়ে দিলেও কবিতাদ্বয়ের ভেতর ভাবানুষঙ্গ-জাত বৈসাদৃশ্য রয়েছে। বোদলেয়ার 'মরণের নৃত্য' এবং 'এক শব' কবিতায় মানুষের লাবণ্যময় শরীরকে কটাক্ষ করেছেন। নার্সিসাসের মতো আত্মপ্রেম-নিবেদিত এবং প্রসাধনচর্চিত শরীর যে শেষ পর্যন্ত কীটদংশনে বিষ্ঠাধারার নামান্তর এবং কঙ্কালই যে মানুষের শেষ সত্য, জীবনের সকল অবোধ উৎসবে জীবিত মানবের প্রতি কঙ্কাল যে এক মূর্তিমান বিদ্রূপ, বোদলেয়ার তাঁর কবিতায় সেটি প্রমাণ করতে সচেষ্ট:

সকল সূর্যের তলে, সব দেশে, মৃত্যু নেয় দেখে
তোদের সঙের ভঙ্গি, রে মানব, বিহ্বল নেশায়,
এবং, তোদেরই মতো, মাঝে-মাঝে মদগন্ধ মেখে
তোদের উন্মত্ত স্রোতে আপনার বিদ্রূপ মেশায়! ('মরণের নৃত্য', বোদলেয়ার ২০১৫: ১১২)

রাহমানের 'নরমুণ্ডের নৃত্য' কবিতার সঙ্গে উল্লিখিত কবিতার মিল পাওয়া না গেলেও তাঁর 'একটি মৃত্যুবার্ষিকী' কবিতার সঙ্গে 'মরণের নৃত্য' কবিতার কিছু সাদৃশ্য মেলে:

জানালায় সিল্ক নড়ে, ভাবি কত সহজেই তারা
তোমাকে কীটের উপজীব্য করেছিল,
সারাক্ষণ তোমার সান্নিধ্যে পেত যারা
অনন্তের সংবাদ। (একটি মৃত্যুবার্ষিকী, শামসুর ২০১৭: ২২৮)

৬

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এক সমালোচনায় মন্তব্য করেছিলেন সমকালীন কবিরা পূর্ব পাকিস্তানি কবিতায় নাগরিকতা কৌলিন্য বিচারে ব্যস্ত হয়ে উঠলেও যে শহর গড়ে উঠছে, সেটি তখনও আয়তন ও স্বভাবে পুরোপুরি নাগরিক নয়। তাই নগরের যে গ্লানি কবিদের আবিল করেছে বলে তাঁদের কবিতায় তারস্বর উঠে আসছে, এ রকম আর্তির হয়তো তখনও সময় হয়নি। তিনি মনে করেন, এই আর্তির ভেতর কোথাও ফাঁক রয়ে গেছে, যেন বুদ্ধি উপলব্ধিকে হাত ধরে চালনা করছে, অভিজ্ঞায় বুঝি সমর্থন নেই অভিজ্ঞতার। কাজেই সমকালীন কবিদের চেতনার নাগরিক ভাবনা তখনও যেন কিছুটা আরোপিত। তবু, নির্মীয়মাণ এই ঢাকা নগরই শামসুর রাহমানের চেতনাকে গভীরভাবে আপ্লুত করেছে। কারণ, আধা-সামন্তবাদী আর আধা-পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোয় নগরের মানুষের অসামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবধান যে বৈষম্যের জন্ম দিয়েছে, শামসুর রাহমান সেই বৈষম্যের স্বরূপ উপলব্ধি করে পীড়িত হয়েছেন। কাজেই এ নগর তখনও আয়তন ও স্বভাব এবং আর্তিতে পুরোপুরি কসমোপলিটন নগর হয়ে উঠতে না পারলেও পঠনপাঠন-সূত্রে বোদলেয়ার, এলিয়ট এবং তিরিশি কবিদের কবিতায় বর্ণিত প্যারিস, লন্ডন এবং কলকাতার আদল নির্মীয়মাণ ঢাকার ওপর আরোপিত হয়ে গেছে। কাজেই বোদলেয়ার যেভাবে নগরকে 'মনোতন এ পেতি' হিসেবে দেখেছেন, রাহমানও বোদলেয়ারের নগর আদলে ঢাকাকে দেখলেন ক্লেদক্লীন্ন রূপাবয়বে। একে অনেকটাই অনুকৃতি বলা যেতে পারে।

তিরিশি কবিদের মাধ্যমে পশ্চিমা কবিদের নেতিবাদে আস্থার বিষয়টিকে কোনো কোনো সমালোচক উপনিবেশিত মানসিকতার প্রকাশ বলে মন্তব্য করেছেন:

> বাংলাদেশের আধুনিক কবিতা পশ্চিমা ভাব স্বভাবের কবিতাই মূলত। উপনিবেশিত জনগোষ্ঠী হিসেবে কলকাতার ভদ্রলোক শ্রেণির হাতে যে বর্ণাঢ্য কাব্যধারা গড়ে উঠছিল, 'আধুনিক' বাংলায়, বাংলাদেশের কবিতা মূলত তারই খাতক। ... আমাদের পঞ্চাশ এবং পরবর্তী কবিকুল প্রায় ব্যতিক্রমহীনভাবে পশ্চিমের অনুকারী। 'আধুনিকতাই' তাদের প্রধান লক্ষ্য, তা সেই 'আধুনিকতা'র স্থানিক রূপ যেভাবেই পুনর্নির্মিত হোক না কেন। কিন্তু তাঁরা পশ্চিমে ঢুকেছেন প্রধানত কলকাত্তাই তিরিশি বাংলা কবিতার হাত ধরে। এ তথ্যের অন্য অনেক গুরুত্বের মধ্যে একটা প্রধান গুরুত্ব এই যে, জীবনের নেতিধর্ম প্রকাশ 'আধুনিক' বাংলা কবিতার একটা অপরিহার্য ব্যাপার বলে গণ্য হয়েছে। তিরিশের আধুনিকতাবাদী কবিরা মূলত এলিয়টি জমানার ইংরেজি কবিতার ভোক্তা। পশ্চিম তখন বিশ্বযুদ্ধে কাবু। আর সেকালের পশ্চিমা কবিতা সেই কাবু-দশার নিগূঢ় ভাষ্য। হুমায়ূন কবির তাঁর বাংলার কাব্যে দাবি করেছেন, কলকাতার মধ্যবিত্তও তখন যথেষ্ট বয়সী আর ক্ষয়িষ্ণু। পশ্চিমা অবক্ষয়ের সাথে কলকাতার অবক্ষয়ের একটা সরল যোগসূত্র এভাবে তৈরি করা হয়ত সম্ভব। ... যেটা বোঝা কঠিন তা হল, পঞ্চাশ-ষাটের ঢাকাই কবিরা নিজেদের মধ্যবিত্ত ইতিহাসের সবচেয়ে জোয়ান বয়সে নেতিধর্মে এতটা ইমান আনলেন কিভাবে। উপনিবেশিত মানসিকতার বরাত ছাড়া একে ব্যাখ্যা করা খুব সহজ নয়। (মোহাম্মদ আজম ২০১৬: ভূমিকা)

উপনিবেশিত মানসিকতার কারণে পশ্চিমা এবং তিরিশি কবিদের অবক্ষয়জাত নেতিবাদ এ কালের কবিদের মানসচেতনায় যুক্ত হয়েছে এ বিষয়টি যেমন সত্যি, তেমনি কালের অভিঘাতও একটি বড় বিষয় বলে মনে করা যেতে পারে।

৭

রৌদ্র করোটিতে কাব্যের বেশ কিছু কবিতায় রাহমান 'আধুনিকতাবাদী নাস্তি আর নাগরিকতায় অনেকটা স্নাত ছিলেন' (মোহাম্মদ আজম ২০২০: ১৬৮)। তবে খুব দ্রুতই রাহমান এই প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পেরেছেন। শামসুর রাহমানের *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* এবং *রৌদ্র করোটিতে* কাব্যে তিরিশি কবিদের আধুনিক চেতনা এবং বোদলেয়ারের প্রভাব কিছুটা প্রলম্বিত হয় তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ *বিধ্বস্ত নীলিমায়* (১৯৬৭)। এ কাব্যের 'আত্মজৈবনিক' কবিতায় এর প্রমাণ মেলে। 'তিরিশোত্তর বাংলা কবিতা এবং আধুনিক ইঙ্গ-মার্কিন কবিতাকে আত্মস্থ করে তিনি কাব্যরচনার সূত্রপাত করেন। প্রথম পর্যায়ে মেদুর, স্বপ্নকুহকময়, নিভৃত নস্টালজিকচেতনা তাঁর কবিতায় ভাষারূপ পায়' (বায়তুল্লাহ্ ২০০৯: ২৬)। তবে, শেষ ষাটে এসে *নিজ বাসভূমে* (১৯৭০) কাব্য থেকে রাহমানের ভেতর এক স্বতন্ত্র কণ্ঠ হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা কাজ করেছে বলেই 'একপাল জেব্রা' কবিতায় তিনি সবিনয়ে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ এবং বিষ্ণু দে'র কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। ক্রমশ তিনি তাঁর কাব্যভাষায় নির্মাণ করেছেন এক স্বকীয় কণ্ঠ, যেখানে উপনিবেশিত মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মীলন ঘটেছে এবং রাষ্ট্রনৈতিক ভাবনায় গভীর দেশাত্মবোধ আর আশাবাদ উচ্চকিত হয়ে উঠেছে।

প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে কাব্যে আমিত্ববোধের ঘেরাটোপ থেকে রাহমান *রৌদ্র করোটিতে* কাব্যে দ্রষ্টা হয়ে উঠলেন। আউটসাইডার-খোলস উন্মোচন করে যুক্ত হতে চাইলেন ঢাকার প্রবল জনস্রোতে। তবে কিছু বিচ্ছিন্নতা রয়েই গেল, যে বিচ্ছিন্নতা তাঁর ভেতর জন্ম দিল নৈঃসঙ্গ্যবোধ, বিষাদ-বিতৃষ্ণা এবং নির্বেদের; সঙ্গে যুক্ত হলো সমকালীন দেশকাল-রাজনীতির অন্তর্ঘাত। ফলে, রাহমানের মানসজগতে ব্যাপ্ত হলো একধরনের নেতিবোধ। পঠনপাঠন-সূত্রে নগরচেতনা ও নেতিনাস্তিবাদ প্রকাশে তাঁর শরণ হয়ে উঠলেন বোদলেয়ার। তবে, এ কথা দ্বিধাহীনভাবে উচ্চারণ করা যায়, শামসুর রাহমান বোদলেয়ারের কাব্যভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হলেও *রৌদ্র করোটিতে* কাব্যে ধ্বনিত তাঁর অনন্য কণ্ঠ স্বকীয়তারই পরিচায়ক।

সহায়কপঞ্জি

আবু সয়ীদ আইয়ুব (২০১৬)। *আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

কুদরত-ই-হুদা (২০২২)। *জাতীয়তাবাদী চিন্তার বিকাশ: বাংলাদেশের ষাটের দশকের কবিতা*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

খোন্দকার আশরাফ হোসেন (১৯৯৪)। *বাংলাদেশের কবিতা: অন্তরঙ্গ অবলোকন*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

খোন্দকার আশরাফ হোসেন (২০১০)। *কবিতার অন্তর্যামী: আধুনিক, উত্তরাধুনিক ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*। ঢাকা: নান্দনিক।

গাউসুর রহমান (২০১০)। *কবিতার শামসুর রাহমান*। ঢাকা: অ্যাডর্ন পাবলিকেশন।

তারানা নুপুর (২০০৬)। 'শহীদ কাদরীর কবিতা: সময় সংকট ও সংবেদনা', *উলুখাগড়া* (সিরাজ সালেকীন সম্পাদিত)। ঢাকা।

বায়তুল্লাহ্ কাদেরী (২০০৯)। *বাংলাদেশের ষাটের দশকের কবিতা: বিষয় ও প্রকরণ*। ঢাকা: নবযুগ।

বুদ্ধদেব বসু (২০১৫)। *শার্ল বোদলেয়ার তাঁর কবিতা* (অনূদিত)। কলকাতা: দে'জ পাবলিকেশন্স।

বেগম আকতার কামাল (২০১৪)। *শামসুর রাহমানের কবিতা: অভিজ্ঞান ও সংবেদ*। ঢাকা: কথাপ্রকাশ।

মলয় রায়চৌধুরী (২০১৯)। 'মহানগরে পথচর বোদলেয়র'। https://malayerprobondha.wordpress.com/2019/11/25/মহানগরে-পথচর-বোদলেয়র-মল/

মোহাম্মদ আজম (২০২০)। *কবি ও কবিতার সন্ধানে*। ঢাকা: কবিতাভবন।

মোহাম্মদ আজম (২০১৬)। *নির্বাচিত কবিতা: সৈয়দ আলী আহসান* (সম্পাদিত)। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

শামসুর রাহমান (১৯৯১)। 'পূর্ব বাংলার সাম্প্রতিক কবিতা', *ত্রৈমাসিক পত্রিকা* শামসুর রাহমান সংখ্যা (মিজানুর রহমান সম্পাদিত)। ঢাকা।

শামসুর রাহমান (২০০১)। *একান্ত ভাবনা*। ঢাকা: সন্ধানী প্রকাশনী।

শামসুর রাহমান (২০১৭)। *কবিতা সমগ্র ১*। ঢাকা: অনন্যা।

শার্ল বোদল্যার (২০১৬)। *শার্ল বোদল্যারের লিপিকা: প্যারিস স্প্লীন* (গৌতম পাল অনূদিত)। কলকাতা: আনন্দ।

সাঈদ-উর-রহমান (২০০১)। *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*। ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সৈয়দ আকরম হোসেন (১৯৮৫)। *বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম (১৯৯১)। 'শামসুর রাহমানের শহর', *ত্রৈমাসিক পত্রিকা* শামসুর রাহমান সংখ্যা (মিজানুর রহমান সম্পাদিত)। ঢাকা।

হায়াৎ মাহমুদ (২০০৬)। 'শামসুর রাহমানের কবিতা', *নির্জনতা থেকে জনারণ্যে: শামসুর রাহমান*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

হুমায়ুন আজাদ (১৯৮৩)। *শামসুর রাহমান: নিঃসঙ্গ শেরপা*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

Baudelaire, Charles (1965). *The painter of Modern Life and Other Essays* (Translated and edited by Jonathan Mayne). London and New York: Phaidon press.

Marx, Karl (1977). *Economic and Philosophic Manuscripts of 1844*, Moscow: Progress Publishers.